বিদেশিনী

শেখর সেন

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৫-২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশক :
শ্রীরামনাথ ঘোষ
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৫-২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৪, অক্টোবর ১৯৫৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীমতী হৈমন্তী মজুমদার (সেন)

মুদ্রক :
শ্রীশুভেন্দু রায়
রামকৃষ্ণ-সারদা প্রিণ্টার্স
৯এ রামধন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৪

উৎসর্গ

প্রয়াত অমল হোম-এর পুণ্য স্মৃতিতে—

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের মধ্যে বিশিষ্টতম, জীবিতকালেই সাংবাদিক রূপে কিংবদন্তীতে পরিণত; সুপণ্ডিত, সুরসিক, অসাধারণ বাক্-পটু, অনন্য আলাপচারি, সুদর্শন সেই বিখ্যাত মানুষটি যিনি ঈশ্বরদত্ত বাক্-শক্তি হারিয়ে তাঁর জীবনের শেষ চোদ্দ বছর রোগ শয্যায় শুয়ে, নিঃসঙ্গ একাকীত্বে, মানসিক সুস্থতার মধ্যে থেকে দুঃসহ দুঃখ, বেদনা এবং এক সময়ের অনেক উপকার গ্রহীতা বন্ধু ও ভক্তদের অনাদর ও বিস্মৃতি অভিমানে বহন করে আমাদের কাছ থেকে নীরবে বিদায় নিয়েছেন, সেই মনীষীর উদ্দেশে আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম !

সূচীপত্র

ল্যাণ্ড্‌স্‌ এণ্ড

নাম তার সোন্‌য়া নিলসেন।

নামটির মতই সুন্দর চেহারা নরওয়ের মেয়ে সোন্‌য়ার। কিন্তু তার প্রকৃতি তার নাম ও চেহারার ঠিক উল্টো। এমন রুক্ষ স্বভাবের দুর্ভাষিণী মেয়ে খুব কমই দেখেছি।

লণ্ডন থেকে বেড়াতে এসেছি কর্ণওয়ালে। ইংলিশ চ্যানেল ও আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গম স্থলে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা কর্ণওয়াল। কর্ণওয়ালের সৌন্দর্য তার সুরম্য পরিবেশে, তার বিশাল প্রান্তরে, তার সমুদ্রের বুক থেকে খাড়া দাঁড়ানো গ্র্যানাইট পাথরের সুউচ্চ স্তূপগুলিতে। তার শান্ত, নিরুপদ্রব গ্রাম, শহর ও বন্দরে।

সেণ্ট জাস্ট আটলান্টিক সমুদ্রের ধারে একটি ছোট গ্রাম। কয়েক হাজার মানুষের বসতি। সেখানে উঠেছি সমুদ্র পারের এক গেস্ট হাউসে। রাতটুকু সেখানে কাটাই আর সারাদিন বাসে করে বেড়াই পেনজেন্স, সেণ্ট আইভ্‌স, ল্যাণ্ডস এণ্ড ও আরো অনেক সমুদ্র শহর গ্রামে।

গেস্ট হাউসটি ভ্রমণকারীদের ভিড়ে পূর্ণ। বেশীর ভাগই যুবক যুবতী। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই সদ্য বিবাহিত। মধু-চন্দ্রমা যাপনে এসেছে এখানে। অন্য যারা এসেছে তারাও কেউ আর সঙ্গী বা সঙ্গিনীহীন নয়।

শুধু আমি একা। এতগুলি জোড়ের মাঝখানে আমি একা বিজোড়। এ ভাবে একা এসে যে ভুল করেছি বুঝতে পারলাম। কিন্তু তখন লণ্ডনে ফিরে যাওয়া চলে না। অনেক টাকা খরচ করে এসেছি, তাই একা একাই কাটাই ওদের সঙ্গে।

পিটার ও তার স্ত্রী ডেইজী আমার একাকীত্বের জন্যে দুঃখিত। কারণ তাদের সঙ্গে আমার একটু বন্ধুত্ব হয়েছে। তাই তারা সমবেদনা

জানায়। বুড়ো দম্পতি রবার্টসনরাও আমার জন্যে ব্যথিত। বুড়ী রবার্টসন রসিক, তাই বলেন, 'তুমি কি গো, এই স্বর্গরাজ্যে এসেছ একা! এখানে যে বিজোড়ে প্রবেশ নিষেধ। দেখ না, স্বয়ং বিধাতাও এটা বুঝেছিলেন বলে সঙ্গীহীন আদমের জন্যে ঈভের সৃষ্টি করলেন।'

আমিও ছাড়ি নি, হেসে বলেছিলাম, 'ঈভের জন্যে বেচারা আদমের যে দুরবস্থা হয়েছিল সেও তো আপনি জানেন মিসেস রবার্টসন! স্বর্গরাজ্যে আর থাকা হল না তার। সে ঐ ঈভের দোষেই!'

'ঈভের দোষে নয় গো, শয়তানের জন্যে।' তিনি বললেন

আমি বললাম, 'কই, শয়তান তো আদমের কাছে ঘেঁষতে পারে নি। ঈভকেই বশ করতে পারল সে!'

এর উত্তরে হয় তো তিনি কিছু বলতেন, কিন্তু পিটার বলে উঠল, 'ও সব বাইবেলের কচকচি এখন থাক। এসেছি ফূর্তি করতে, না না বাইবেল খুলে বসলে তোমরা!'

হেসে বললাম, 'আধুনিক স্বর্গ রাজ্যে দেখছি ভগবানের স্থান নেই!'

দু'একদিন পরেই চলে যাবো ভাবলাম। সে কথা পিটারকে বলতে সে বললে, "আর তোমাকে যেতে হবে না। তোমার সঙ্গিনী এসে গেছে!"

বললাম, 'কি রকম?'

সে বললে, 'তোমারই পাশের ঘরে উঠেছে সে। কাল রাত্রে এসেছে, তোমারই মতো একা।'

'তাই নাকি?'

'চেহারাটি তার অতি সুন্দর, কিন্তু বেশ রোগা। মনে হল রোগ আছে। সাবধানে মিশো।'

বললাম, 'কোথায় কি তার ঠিক নেই! তুমি তো একেবারে সব ব্যবস্থা করে বসে আছ!' তারপর থেমে বললাম, 'তাছাড়া লণ্ডনে তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।'

'আমরাও ফিরবো সামনের সপ্তাহে। এক সঙ্গেই ফেরা যাবে।'

'সেই কথাই রইল। তোমাদের সঙ্গে এসেছি এক ট্রেণে, এক ট্রেণেই যাবো ফিরে।'

কিন্তু সোনয়াকে তার ঘরের বাইরে বেরোতে দেখা গেল না। সর্বক্ষণ সে ঘরের মধ্যেই কাটায়। কারো সঙ্গে মেশে না। ঘরের দরজা ভেজানো থাকে, কাজেই জানা যায় না সে সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যে কি করে।

ব্রেক ফাস্ট ও ডিনার সে খায় ঘরের মধ্যেই। লাঞ্চও বেশীর ভাগ দিন ঘরেই খায়। যদি কেউ না থাকে ডাইনিং রুমে, তখন হয় তো সেখানে খেতে বসে।

গেস্ট হাউসের কর্ত্রী মিসেস ওয়েব্স্টার বললেন সেদিন 'মেয়েটি কেমন যেন! বেরোয় না ঘর থেকে। তার ওপর আমি নিজেই তার খাবার তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসি, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিন্তু সে শুধু হুঁ হাঁ করা ছাড়া আর কিছুই বলে না।'

এ ভাবে ঘরের মধ্যে দিন রাত নিজেকে বন্দী করে রেখেছে কেন মেয়েটি? তবে এল কেন কর্ণওয়ালে সুদূর লণ্ডন থেকে এত টাকা খরচ করে? কেউ কেউ জল্পনা করে।

সেদিন সোনয়া তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাথরুমের দিকে। আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তখন খুবই সকাল, অন্যান্য বোর্ডাররা ওঠে নি কেউ।

সোনয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, 'সুপ্রভাত।'

সে একবার আমার দিকে তাকাল এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর ঘাড় নীচু করে কি যে বললে, বুঝতেই পারলাম না স্পষ্ট করে। হয় তো সুপ্রভাত কথাটাই উচ্চারণ করল সে। পরক্ষণে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে।

সেদিনই সকালে একটি বাসে করে আমরা চল্লিশ জন যাত্রী

যাবো সেণ্ট আইভস্‌-এ। সেই সঙ্গে দেখে আসবো পথে যে শহরগুলি পড়ে। একটি প্রকাণ্ড কোচ ভাড়া করা হয়েছিল সকলের চাঁদা তুলে।

কোচটি এসে দাঁড়িয়ে আছে মার্কেট স্কোয়ারে। জোড়ে জোড়ে গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে চলেছে সকলে সেই দিকে তৈরী হয়ে। সারাদিন ঘুরবো, ফিরতে সেই রাত হবে।

কেবল যাচ্ছে না সোন্‌য়া। তাকে মিসেস ওয়েব্‌স্টার বলতে সে আগেই ছোট্ট 'না' জানিয়ে দিয়েছে গতকালই, যখন আমরা সকলে মিলে যাওয়া ঠিক করছিলাম।

একজন যাত্রী এসে বললে, 'একটা জায়গা খালি রয়ে গেছে। ড্রাইভার বলছে যদি আর কেউ যায় তো নিয়ে নাও। নয় তো বাইরের অন্য কাউকে নেবে সে।'

গেস্ট হাউসের আমরা যারা বাসিন্দা, তাদের মধ্যে বেশ একটা সহজ হৃদ্যতা হয়ে গেছে কয়েকদিন এক সঙ্গে থাকা ও ঘোরার ফলে। সবাই চিনি সবাইকে। তাই বাইরের কাউকে নিতে সকলের আপত্তি।

আমি মিসেস ওয়েব্‌স্টারকে বললাম, 'আপনিই চলুন না মিসেস ওয়েব্‌স্টার! আমাদের পরিচর্যাতেই কাটছে আপনার সর্বক্ষণ। একদিন না হয় ঘুরে এলেন, বিশ্রাম নিলেন।'

তিনি বললেন, 'সে হয় না। মিঃ ওয়েব্‌স্টারের আজ ছুটি। তিনি বাড়ী থাকবেন। এক মেয়েও আসছে প্লীমাউথ থেকে তার স্বামীর সঙ্গে। কাজেই আমার যাওয়া সম্ভব নয়।'

আমি বললাম, 'তাহলে অবশ্য আপনাকে অনুরোধ করা ঠিক হবে না।'

পিটার বললে, 'একটা সিট না হয় খালিই থাকল। কি হয়েছে তাতে?

ডেইজী বললে, 'এক কাজ করলে হয় না?'

'কি?' পিটার জিগ্যেস করল।

'আর একবার দেখলে হয় না? সোন্‌য়া যদি যায়!'

পিটার বললে, 'কে যাবে ওকে বলতে! ওতো আগেই না করে দিয়েছে।'

মিসেস ওয়েব্‌স্টার বললেন, 'হ্যাঁ, আর একবার ওকে বলা দরকার। যেতেও তো পারে।'

আমি বললাম, 'আপনি তাহলে একবার গিয়ে বলুন না মিসেস ওয়েব্‌স্টার।'

'আমি! না বাপু। ওর সঙ্গে কথা বলব কি! ও তো উত্তরই দেয় না কথার!' তিনি বললেন।

পিটার বললে, 'সেন, তুমিই যাও না কেন?'

'আমি!'

'হ্যাঁ, তুমি। দেখ না চেষ্টা করে।'

আমি তার সঙ্গে এ পর্যন্ত কথা বলি নি। সে সুযোগই পাই নি আজ সকাল বেলায় যা এক সুপ্রভাত করা ছাড়া। তাও সে তার উত্তরও দিল না ভালো করে।

বললাম, 'ডেইজী যাক না।'

ডেইজী বললে, 'তোমার যেতে আপত্তি কিসের? বাঘ ভাল্লুক তো নয়—যে খেয়ে ফেলবে!'

বললাম, 'জানো, আমি "রয়াল বেঙ্গল টাইগারের" দেশের লোক। ও সব বাঘ ভাল্লুককে ভয় করি না! কিন্তু বদ মেজাজী লোককে আমার বড় ভয়!'

সবাই হেসে উঠল।

ওদিকে আর সময় নেই। একজন এসে বললে, 'বাস ছাড়ার সময় হয়ে এল।'

অগত্যা আমি উঠলাম। একতলার লাউঞ্জে বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম। পিটার ও ডেইজী নীচে সিঁড়ির প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওপরে উঠে ওদের দিকে তাকাতে, ওরা হেসে হাত নাড়ল।

দরজায় আওয়াজ করতেই শুনতে পেলাম সোনয়ার গলা। 'কে ?'

'আমি ! সেন।'

'সেন ! কে সেন ?'

'কে সেন নয়, এস সেন। ভেতরে একটু আসতে পারি কি ?'

'দরজায় তালা লাগানো নেই। আসতে বাধা কোথায় ?'

শুনেই তো দমে গেলাম, সম্বর্ধনাটা কেমন হবে কে জানে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম।

দেখি একটা সোফায় বসে আছে সোনয়া. তার সামনের নীচু জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে নীল সমুদ্র। সূর্যের আলোয় রূপোর মতো চিক চিক করছে তার জল।

'তুমি ! কি নাম বললে তোমার ?'

'এস সেন। তোমারই সগোত্র আর কি ! তুমি সোনয়া মিলানো, আমি শেখর সেন। নামের প্রথম হরফে মিল, পদবীতেও মিল।'

'হুঁ।' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে শুনছিল সে। আমার রসিকতা যে তাকে কোথাও স্পর্শ করেছে. তার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না তার চোখে মুখে।

'সত্যিই কি তোমার নাম শেখর সেন, না চালাকি করে বলছ ?'

বলে কি ! অবাক হয়ে বললাম, 'নিজের নাম বলায় চালাকির কি আছে তা তো বুঝলাম না ! বিশ্বাস না হয় গেস্ট হাউস শুদ্ধ লোককে জিগ্যেস করতে পারো। আর তাতেও যদি না হয় তো পাসপোর্ট দেখাতে পারি।'

তবু তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখলাম না। বরং সে আরো যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে, 'কি মতলব ?'

'মতলব ? মতলব আবার কি ?'

'কিসের জন্যে এসেছ এখানে ?'

'এখানে মানে—কর্ণওয়ালে ? না, তোমার ঘরে ? কোনটা জানতে চাইছ ?' আমি তবু আশা ছাড়লাম না তাকে একটু হাসাবার।

কিন্তু সে মোটেই হাসল না। বললে, 'ও সব রসিকতা তোমার বন্ধুদের সঙ্গে করো। আমার সঙ্গে নয়, বুঝলে ?'

'বুঝেছি, আচ্ছা চললুম।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখি পিটার ও ডেইজী তখনো নীচে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে।

পিটার বললে, 'এতক্ষণ কি করছিলে ? প্রেম করছিলে না কি ?'

'প্রেমই বটে ! তবে সব প্রেম প্রেম নয় ! বুঝেছ ?'

'হল কি ?' ডেইজী বললে, 'ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলে তোমার মেজাজটাও ওর মতন হল দেখছি !'

মিসেস ওয়েব্‌স্টার বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। বললেন, কি হল, বাজী হল না বুঝি ?'

'বাজী ?' বললাম, 'যাবার কথা তুলতেই পারলাম না তার কাছে !

মিসেস ওয়েব্‌স্টার বললেন, 'আমি জানতাম। আমার গেস্ট হাউসে আজ কুড়ি বছর ধরে কত লোক এসেছে, এ-রকমটি দেখিনি কখনো ! অদ্ভুত মেয়ে !'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। আর দেখা হল না সোনয়ার সঙ্গে। আগের মতই ঘরের মধ্যে রইল সে সর্বক্ষণ নিজেকে বন্দী করে।

এখন আর ওকে নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাই না। সব গবেষণা থেমে গেছে ওর সম্বন্ধে। ও যে এই গেস্ট হাউসেই আছে—এ কথাও যেন এরই মধ্যে ভুলতে বসেছে সকলে।

কিন্তু আমি ভুলতে পারি নি। সেদিন তার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি তার রুক্ষ কঠিন মুখ। সুন্দর মুখের ওপর কালিমার রেখা। সত্যিই কি সে এমন রুক্ষ প্রকৃতির মেয়ে।

কেন সে এড়িয়ে চলে সকলকে এমন করে? আর কেনই বা সে এসেছে এই কর্ণওয়ালে!

সন্ধ্যের সময়ে ফিরছি মার্কেট স্কোয়ারের কাছ থেকে। দেখি একটা ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে এল সোন্য়া। তার দু'হাতে বড় বড় প্যাকেট কয়েকটা। ভারী মনে হল সেগুলি। দোকানে কিছু জিনিসপত্র কিনেছে সে।

এই প্রথম তাকে বেরোতে দেখলাম।

আমি কাছে এগিয়ে এসে বললাম, 'তোমার বোঝাটা খুব ভারী মনে হচ্ছে। আমি কিছু নিতে পারি কি?'

'আমার বোঝা হালকা করবার জন্যে হঠাৎ তুমি কোত্থেকে উড়ে এলে?'

দমে গেলাম। বললাম, 'আমি উড়ে আসি নি। পথ দিয়ে হেঁটেই আসছিলাম। তোমাকে দেখে একটু এগিয়ে এলাম। যদি কোনো সাহায্য করতে পারি।'

'আমার কারো সাহায্যের দরকার নেই।'

'তুমি অসুস্থ, তাই—'

'আমি অসুস্থ তোমাকে কে বললে?'

'অন্যে কেউ বলে নি। তোমার চেহারাই বলে দিচ্ছে সে কথা!'

আমার মুখের দিকে চেয়ে সোন্য়া বললে, 'আচ্ছা, বলতে পারো তুমি কেন আমার পেছনে লেগেছ এমন করে? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি?'

আমি তাকালাম তার দিকে। তারপর বললাম, 'আমি জানতাম না যে তুমি এতখানি বিরক্ত হবে। আমি দুঃখিত মিস নিলসেন, আমাকে ক্ষমা করো।'

'ক্ষমা! হুঁঃ।'

সে হন হন করে এগিয়ে গেল। আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে।

কাল দুপুরের ট্রেনেই রওনা হব লণ্ডনে পেনজেন্স স্টেশন থেকে। পিটার ও ডেইজীও হবে আমার সঙ্গী।

এখানে এসে একবার ল্যাণ্ডস এণ্ড-এ গেছিলাম। আজ আবার যাবো সেখানে। সেণ্ট জাস্ট-এর সবচেয়ে কাছে সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম। ইংলণ্ডের তটরেখার এইটেই সর্বশেষ প্রান্ত। আবার সর্বপ্রথমও।

আমাদের কোচ দাঁড়িয়ে আছে মার্কেট স্কোয়ারে। লোকজন উঠছে। একটু পরেই ছাড়বে।

কাল মাঝরাত থেকেই ঝড় শুরু হয়েছে। সমস্ত আকাশ মেঘে আছে ঢেকে। এতদিনের মধ্যে প্রকৃতির এমন রুদ্র রূপ আর দেখি নি। ভোর রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা।

অনেকে যেতে চাইল না এই জল ঝড়ের মধ্যে। যারা দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাবে কর্ণওয়াল ছেড়ে—তারাই শুধু চলেছে। তাই আজকের কোচটি আমাদের ছোট ষ্টেশন ওয়াগন।

সব ক'টি আসনই দখল হয়ে গেছে। দু'টি ছাড়া। আমি এসে বসলাম একটিতে। ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজের সিটে বসে ষ্টার্ট দিল।

এমন সময় দেখি ছুটতে ছুটতে আসছে সোন্‌য়া। হাত দিয়ে থামতে বলছে সে আমাদের।

আমরা সবাই অবাক হয়ে তাকালাম। ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

সোন্‌য়া এগিয়ে এল। হাঁপাচ্ছে সে ছুটে আসার জন্যে, ড্রাইভারের সামনে গিয়ে বললে, সেও যাবে।

ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। একটি মাত্র সিট খালি ছিল আমার পাশে। সোন্‌য়া চারদিক একবার দেখে নিয়ে আমার পাশেই বসে পড়ল।

যাত্রীরা সকলেই বেশ অবাক হয়ে গেছে—আমিও কম অবাক হই নি। সোন্‌য়া আজ বেরিয়েছে। সঙ্গিনী হয়েছে আমাদের!

কেউ কোনো কথা বলল না। আমিও মুখ ফিরিয়ে রইলাম অন্য দিকে।

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উঁচু চুড়োর ওপর একটি বাড়ী। তার মাথায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডে লেখা "দি ফার্স্ট এণ্ড দি লাস্ট হাউস ইন ইংলণ্ড।" আরো দূরে সমুদ্রের বুকে দেখা যাচ্ছে 'লং শিপ্‌স লাইট হাউস'।

বাড়ীটির কাছে এসে আমাদের গাড়ী থামল। নেমে পড়লাম আমরা সকলে। আজ ল্যাণ্ডস এণ্ডে ভ্রমণার্থীদের ভিড় নেই।

আমার পাশেই চলছিল সোনয়া।

আজ আর তাকে রুক্ষ মনে হচ্ছে না, মুখের ও কপালের রেখাগুলি কঠিন হয়ে ওঠে নি। বরং একটা স্নিগ্ধ ভাব যেন ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

সে হঠাৎ বললে, 'ল্যাণ্ডস এণ্ড! ইজ ইট অলসো দি জারনিস এণ্ড?'

বিস্মিত হয়ে তাকালাম তার দিকে। এত মিষ্টি স্বর, এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর তার কোথায় লুকিয়ে ছিল এত দিন? তার প্রশ্নটিও বড় সুন্দর। সব দিক দিয়েই আজ বিস্মিত করে তুলল সে আমাকে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বললে, 'আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না যে!'

'কি প্রশ্ন বল?'

'ইজ ইট অলসো দি জারনিস এণ্ড?'

সমুদ্রের কাছে এসে গেছি। ঝড়ের মাতন চলেছে। এমন ঝড় এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সমস্ত দিগন্ত জুড়ে ঘন কালো মেঘ, ঝড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। পথ চলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে।

সোনয়ার মাথার স্কার্ফ উড়ছে বাতাসে। তার সোনালী চুলগুলি এসে পড়েছে চোখে মুখে।

সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। ঢেউগুলি কি তোড়েই না উঠছে ফুলে ফুলে। ক্ষেপে গেছে আজ এই আটলান্টিক মহাসাগর!

সেই দিকে চেয়ে বললাম, 'এক যাত্রার শেষ এখানে। কিন্তু ঐ মহাসাগরের ওপারে আর একটা দেশ আছে, সেখান থেকে শুরু নতুন যাত্রার।'

সোনুয়া আমার দিকে চেয়ে রইল, কিছু বলল না।

'অত কাছে যেও না!' কয়েকজনকে সেই পাহাড়ের শেষ প্রান্তে এগিয়ে যেতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল রক্ষী দলের একজন।

খাড়া উঁচু গ্রানাইটের পাহাড় সমুদ্রের তলদেশ অবধি নেমে গেছে তার মাথায় দাঁড়ালে দেখা যায় একদম নীচে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সশব্দে কঠিন পাথরের বুকে। মাথায় একটি টেলিস্কোপ বসানো আছে। সমুদ্রের বহুদূর অবধি দেখা যায় তাতে।

আজ আর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে দেখা যাবে না নীচে সমুদ্রের বুকে ঢেউএর খেলা। অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে---নইলে প্রচণ্ড ঝড়ের তোড়ে নিজেকে হয় তো সামলানো কঠিন হবে, যে কোনো সময়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেতে পারি নীচে। আর পড়লে, মুহূর্তের মধ্যে ঐ ভয়ঙ্কর ঢেউগুলি কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, কেউ পাবে না তার ঠিকানা।

কিন্তু দূরেও দাঁড়ানো গেল না। বৃষ্টি নামল সারা আকাশ ভেঙ্গে। সেই বাড়ীর দিকে অনেকে ছুটল আশ্রয়ের জন্যে, অনেকে কাছের এক ছোট রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল।

আমি সেই বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম ছুটে গিয়ে সোনুয়ার হাত ধরে। সে ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

এই প্রথম হাসতে দেখলাম তাকে।

আমিও হাসলাম।

কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি থেমে গেল।

সকলে বেরিয়ে পড়ল আবার। সমুদ্রের দিকে না গিয়ে অন্যদিকে বেড়াতে লাগল। বৃষ্টি থামলেও ঝড় থামেনি একটুও।

খিদে পেয়েছিল। সোন্য়াকে বললাম, 'খাবে কিছু?'

'খাবো।'

পথের দু'ধারে সাদা চওড়া পাথরের ছোট ছোট নিশান। একট দেখিয়ে বললাম, 'তুমি এখানেই বস। আমি রেস্তোরাঁ থেকে কিছু কিনে আনি।'

কিছু আগেই সেখানে ঢুকতে গিয়ে দেখে এসেছিলাম একটি সিটও খালি নেই। তাই সেখান থেকে কিছু খাবার কিনে আনাই ঠিক করলাম।

সোন্য়া আমার হাত ধরে বললে, 'একটা কথা।'

'বল।'

'আমি তোমার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করেছি, তার জন্যে আমার ওপর নিশ্চয়ই রাগ করেছ?'

'আমি তোমার ওপর রাগ করি নি! তবে দুঃখ পেয়েছি—আমাকে আঘাত দেবার জন্যে নয়। তুমি কোনো কারণে নিজের মনেই কষ্ট পাচ্ছ—এই কথা ভেবে।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হলাম আমার ওপর তোমার রাগ নেই জেনে।' সে হাত ছেড়ে দিল।

খুবই অবাক হয়ে গেছিলাম সোন্য়ার ব্যবহারে। তার রুক্ষ কঠিন দুর্ব্যবহারও যেমন বিস্মিত করেছিল আমাকে, তেমনি আজ তার এই পরিবর্তনও আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কেনই বা এই দুর্ব্যবহার এতদিন ধরে—আর আজ কেনই বা এই সহজ সুন্দর রূপ তার!

রেস্তোরাঁর কাছাকাছি গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকালাম দেখি সোন্য়া সেখানে বসে নেই। সে এগিয়ে চলেছে মন্থর পায়ে পাহাড়ের সেই চুড়োর দিকে।

আমি চীৎকার করে ডাকলাম, 'সোন্য়া!'

ঝড় উল্টো দিকে বইছে, তাই হয় তো আমার ডাক সে শুনতে পেল না।

আবার চীৎকার করে ডাকলাম, 'সোন্‌য়া।'

এবার বোধ হয় শুনতে পেল, সে পেছন ফিরে তাকাল, তারপর ডান হাতটা উঁচু করে তুলে নাড়ল একবার। অতদূর থেকেও মনে হল এক অপরূপ হাসি তার মুখে ফুটে উঠেছে!

চীৎকার করে বললাম, 'ও দিকে যেও না। পড়ে যাবে।'

সে হাত নেড়ে ইসারায় জানাল সে আর এগোবে না।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু স্ন্যাকস কিনে বেরোতে একটু দেরী হল ভিড়ের জন্যে। বেরিয়ে এসে তাকিয়ে দেখলাম যেখানে সোন্‌য়াকে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম—সেখানে সে নেই। যেখানে গিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল চুড়োর কাছাকাছি, সেখানেও দেখতে পেলাম না তাকে।

এগিয়ে গেলাম তার খোঁজে। চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। পথে প্রান্তরে, নীচে নেমে সমুদ্রের ধারে ধারে। সারা ল্যাণ্ডস এণ্ড, শুধু আমি নয়। প্রত্যেকে।

কোথাও আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ বলতে পারল না তার খবর।

সকলের সেই নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির মধ্যে আমার কানে শুধু বাজছে তার সেই ছোট্ট প্রশ্ন, 'ইজ ইট অলসো দি জারনিস এণ্ড!'

আর কেউ নয়, একমাত্র ঐ ভয়ঙ্কর বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলিই বলে দিতে পারে তার সঠিক খবর!

মাঝ রাতে আমরা ফিরে এলাম সেণ্ট জাস্ট-এ।

ক্লান্ত নির্জীব পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম ওপরে। সামনের ঘরটিতেই থাকত সোন্‌য়া। এখনো রয়েছে সে ঘরে তার সমস্ত জিনিষপত্র।

একবার সেই দরজার দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

আলো জ্বেলে দেখি মেঝের ওপর একটি খাম। বিস্মিত হয়ে তুলে

নলাম। তাতে আমার নাম লেখা। কেউ দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে।

আলোর নীচে গিয়ে খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করলাম। সোনিয়া চিঠি। আমাদের সঙ্গে বেরোবার আগেই সে রেখে গেছে এই চিঠি সে লিখেছে—

প্রিয় শেখর সেন,

আমাকে অত্যন্ত অভদ্র অসভ্য বলেই ধরে নিয়েছ তুমি। সত্যিই আমি তাই।

কিন্তু এ রকম ছিলাম না আমি, বিশ্বাস করো। এক বছর আগেও আমার মতো হাসি খুসি হুল্লোড়ে মেয়ে খুব কমই ছিল অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে। ইংরেজী সাহিত্য পড়তাম আমি। দেহ মন দুই ছিল খাঁটি।

তারপর ইংরেজী সাহিত্যে আরও পড়াশুনো করতে এলাম লণ্ডনে। ধনী বাবা মার একমাত্র মেয়ে, আদুরে। আঘাত পাইনি কখনো কারো কাছে। দূরেও থাকিনি কখনো এর আগে।

লণ্ডনে এসে ভালবাসলাম একজনকে। আমার সেই প্রথম ভালবাসার উপহার-স্বরূপ পেলাম এক কঠিন রোগ। আমাকে রোগাক্রান্ত দেখে সে সরে গেল। পালাল আমাকে ছেড়ে। রোগের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেলাম আমি। চিকিৎসা করালাম। রোগ সারল অনেকটা—কিন্তু মন আমার গেল বিষিয়ে চিরদিনের জন্যে। সমস্ত পৃথিবীর ওপর আমার মন গিয়েছে অবিশ্বাসে ভরে। বিশেষ করে পুরুষ মানুষকে সাপের চেয়েও মনে করেছি সাংঘাতিক জীব। এই এক বছর ধরে তিলে তিলে যুঝেছি, লড়েছি মনের সঙ্গে। কিন্তু ভাঙা মন জোড়া লাগলো না আর। দেশে ফেরার পথও বন্ধ। এই দূষিত দেহ মন নিয়ে ফিরে যেতে পারি না মা বাবার কাছে।

ভেবেছিলাম কর্ণওয়ালে এসে এখানকার সুন্দর আবহাওয়ায় শরীর সারবে, আর মনটাও ভাল হবে। কিন্তু তা হল কই?

কোথায় যাবো আমি? কি করবো এই দেহ মন নিয়ে? তাই একটা পথ বেছে নিয়েছি। ঐ মহাসমুদ্র কি পারবে না শুদ্ধ ভাবে আবার নতুন করে ফিরিয়ে দিতে আমার সেই খাঁটি দেহ মনকে?

ইতি

সোনয়া নিলসেন

সমুদ্রের গর্জন অনেকক্ষণ থেমে গেছে। ঢেউগুলি আর উত্তাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে না রুদ্ধ আক্রোশে। ঝড়ের মাতন বন্ধ। আকাশের কালো মেঘগুলি গেছে সরে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সমুদ্রের বুকে। তারই আলোয় চিক্ চিক্ করছে শান্ত জলরাশি।

আর মনে হচ্ছে, এ-পারের যাত্রা শেষ করে, ওপারে যাবার আগে, সমুদ্রের মধ্যে থেকে উঠে এসে সোনয়া যেন দাঁড়িয়েছে ঐ চূড়োর মাথায়। স্কার্ফ তার গিয়েছে খুলে বাতাসে। সোনালী চুলগুলি এসে পড়েছে মুখে কপালে চোখে। ডান হাত তুলে সে নাড়ছে আমার দিকে, আর সেই অপরূপ হাসি যেন তার মুখে চোখে উঠেছে ফুটে!

শুদ্ধ হয়ে গেছে তার দেহ মন মহাসাগরের জলে!

মরিণের গল্প

অদ্ভুত মোহময় রাত আজ লণ্ডনের।

গ্রীষ্মের রাত, সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ে অল্প কিছুক্ষণ হল থেমেছে। লোকে ছাতা মুড়ে চলেছে, ম্যাক ঝুলিয়ে নিয়েছে কাঁধের ওপর। দিনের আলোর সেই কর্মমুখর চঞ্চল নগরীর এখন বিশ্রাম। পথচারীদের তাড়া নেই, ছুটোছুটি নেই বাস টিউব ধরার তাগিদে। রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় কম। 'বিগবেনে'র ঘড়িতে একটু আগেই সাড়ে এগারটা বাজার আওয়াজ স্তব্ধ হয়েছে। সিনেমা থিয়েটারগুলি গেছে বন্ধ হয়ে। পর পর কয়েক পাঁইট বিয়ার উদস্থ করে 'পাব' থেকে বেরিয়ে এসে যারা এতক্ষণ খোলা হাওয়ায় গরম শরীরটাকে ঠাণ্ডা করছিল ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারের চত্বরে বসে, তারাও একে একে গেছে চলে।

সোহো পল্লীর অলি গলি ঘুরে চলেছি। গলিগুলিতে আধো আলো আধো আবছা অন্ধকার। কন্টিনেণ্টাল রেস্তোরাঁগুলির তুই একটি তখনো খোলা। বন্ধ দরজার কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভেতরের আলো এসে পড়েছে রাস্তায়, দরজার হাতলে ঝুলছে 'ওপ্‌ন্' লেখা বোর্ড।

আশপাশ দিয়ে মাঝে মাঝে লোক চলেছে। তাদের চলাফেরা ভাবভঙ্গি স্বাভাবিক মনে হয় না। ট্রাউজারের তু'পকেটে তু'হাত ঢুকিয়ে দাঁতে পাইপ চেপে কেউ কেউ চলেছে। দৃষ্টি কিন্তু ঘুরছে চারপাশে। মনে হচ্ছে কিসের অন্বেষণে যেন ওদের এই ঘোরা।

রাস্তার মোড়ের কাছে, বন্ধ দোকানের দরজার পাশে, কোনো বাড়ীর পোর্টিকোর নীচে, আবছা অন্ধকারে মেয়েগুলি ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে। তারা কখনো কখনো চলে ফিরে বেড়াচ্ছে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে। লোকগুলি তাদের গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে, ওরই মধ্যে হয়ে যাচ্ছে ওদের কথাবার্তা দরাদরি।

শাফ্‌ট্‌স্‌বারি এ্যাভিন্যুতে পড়তেই একটি কনস্টেবল-এর মুখোমুখি। আমায় দেখে বললে, 'বিদেশী তুমি, এত রাত্রে এ অঞ্চলে ঘোরা ঠিক নয়, বিপদজনক।'

বললাম, 'এই তো ফিরে যাচ্ছি বাড়ী।'

'গুড নাইট।' সে বুটের শব্দ করতে করতে এগিয়ে গেল। আমি ধরলাম উল্টোদিকের একটি গলি।

মাঝরাতের সোহোর বিচিত্র রূপ ও অভিজ্ঞতার আকর্ষণে আমার এই নৈশ ভ্রমণ।

একটু এগোতেই একটি বিখ্যাত হোটেল, তার অন্ধকার পোর্টিকোর নীচে বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ল্যাম্প পোস্ট একটু দূরে, তাই আবছায়া এই জায়গা।

একটি মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমার সামনে এসে সে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে সেই আবছা আলোতে দেখে একটু হেসে বললে, 'হ্যালো!'

আমিও হাসলাম, 'হ্যালো!'

সে এবার আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। অন্ধকারেই দেখলাম, সে সুন্দরী যুবতী, লম্বা, সুগঠনা। ব্লাউজ ও স্কার্ট পরনে, হাতে ছাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ।

আমি বললাম, 'তুমি যা ভেবে এগিয়ে এসেছ আমার কাছে, সে রকম কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। তুমি ভুল করেছ।'

সে খানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আচ্ছা! তোমার যদি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থেকে থাকে তবে এই রাতে কুখ্যাত সোহো পল্লীতে কি করছ জানতে পারি কি?'

'আমার একটা মহৎ উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। সেটা হল—এই রাতে সোহোর জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ করা ও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।'

'কিন্তু তুমি এর সবটা দেখতে পাচ্ছো না! পথে পথে ঘুরে কতটা দেখবে যদি না এই পথচারিনীদের অন্দর মহলে প্রবেশ করো!'

বেশ অবাক হলাম তার কথায়। এই ধরনের মেয়েদের কাছ থেকে বুদ্ধিদীপ্ত কথা আশ্চর্যের বৈ কি! যদিও এই সব মেয়েদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু একটা আশা করিনি এদের কাছে!

বিস্ময় চেপে বললাম, 'এই সব পথচারিনীদের জীবনের ছবিটা না দেখলেও জানি, তাই নতুন করে কিছু জানার নেই।'

'তবু এমন কিছু তো থাকতে পারে যা তোমার অজানা। অভিজ্ঞতার বাইরে। যাদের তুমি দেখছ তারা যে অন্য জগতের মানুষ!'

স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি এ আমার অভিজ্ঞতার অতীত, তার কথায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। যদি এই রকম কোনো মেয়ে এই জগতে থাকে তবে আমার কাছে তা সত্যিই নতুন। তাই কৌতূহল হল, বললাম, 'বেশ, সেটা কি রকম?'

মেয়েটি বললে, 'কিন্তু তোমার যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকে তো সে জগতের খবর নিয়ে তুমি কি করবে?'

'কারণ', আমি একটু থেমে বললাম, 'আমি একজন সাহিত্যিক। জীবনকে জানাই আমার কাজ।'

আধ ঘন্টা পরে আমি আমার কেনসিংটনের বাসায় ফিরে এলাম, সঙ্গে সেই মেয়েটি।

দরজা খুলে আলো জ্বালালাম। মেয়েটি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে দিল ঘরে ঢুকে।

আমি ম্যাকিনটোশটা দরজার ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে দিলাম। সে টেবিলের ওপর তার ছাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ রাখল। তারপর সোফায় বসে বললে, 'এখন যদি তোমার ল্যাণ্ডলেডি হঠাৎ এসে দরজায় ধাক্কা দেন?'

হেসে বললাম, 'তাহলে তিনি জানবেন আমি গভীর ঘুমে অচেতন।'

'আর যদি সন্দেহ করে পুলিশ ডাকেন?'

আশংকা ছিল বৈ কি! মনে মনে খুব স্বস্তি বোধ করছিলাম না। প্রতি মুহূর্তই ভয়ের মধ্যে কাটছিল। নিজের দুঃসাহসিতাকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না। রাগ হচ্ছিল নিজের ওপরই।

মুখে সে ভাব গোপন করে বললাম, 'যাক সে সব কথা। এখন তোমার নাম বল?'

'মরিণ।'

'নামটি তো বেশ মিষ্টি। কন্টিনেণ্ট থেকে নিশ্চয়ই?'

'ভিনিসের মেয়ে আমি।'

'তাই এত সুন্দর!'

সোহোতে বা ট্যাক্সিতে তাকে আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা হয় নি। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম—সত্যিই সে নিখুঁত রূপসী।

'তুমি তো ইণ্ডিয়ান 'তাই না?'

'হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ানদের চেনা শক্ত নয়।'

'পাকিস্থানীদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ানদের খুব সাদৃশ্য। চেনা যায় না, পরিচয় না দিলে।'

বললাম, 'তার কারণ পাকিস্থানের জন্মের আগেও আজকের পাকিস্থানীরা ছিল, আর তাদের বলা হতো ইণ্ডিয়ান।'

ম্যাণ্টল্‌পিসের ওপর অনেকগুলি বই সাজানো। মরিণ উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বইগুলির নাম দেখতে দেখতে বললে, 'তোমার লেখা কোনো বই নেই?'

টেবিলের দেরাজ টেনে বার করলাম নিজের লেখা বই। তারপর সেটি বাড়িয়ে দিলাম মরিণের দিকে।

পাতাগুলি আগ্রহের সঙ্গে উল্‌টিয়ে চলল সে। তারপর বললে, 'অদ্ভুত অক্ষরগুলি! এ কি সংস্কৃত?'

'বাংলা। আমি কলকাতার লোক কি না. তাই আমার ভাষা বাংলা।'

সে বই-এর পাতাগুলি উল্‌টিয়ে যেতে লাগল।

আমি কোনো কথা না বলে সিগারেট কেসটি তার দিকে এগিয়ে দিলাম। সে ঘাড় নেড়ে না জানিয়ে আবার বইএ মন দিল। আমি একটি সিগারেট ধরালাম কিছু না বলে।

হঠাৎ মরিণ বললে, 'তুমি এখন কিছু লিখতে পারো?'

আমি অবাক হলাম, 'মানে?'

'মানে সোজা, লেখককে লিখতে বলায় অবাক হবার কি আছে?

'কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ এ খেয়াল?'

'খেয়ালের আবার সময় অসময় কি? তাছাড়া, যখন এখানে এসে তোমার লেখা বই দেখছি আর স্বয়ং লেখক সামনে বসে. তখন এতে অবাক হবার কিছু নেই।'

আজ যেন আমার কেবল বিস্মিত হবার পালা। সোহোর অলি গলি ঘুরে অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাই পেয়েছি, মরিণকে দেখে তার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে রাত্রির সোহোর রহস্যময় বিস্ময়কর পরিবেশে মরিণের মতো মেয়েরাই বুঝি স্বাভাবিক।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বললে. 'কি ভাবছ? কি লিখবে তাই?'

আমি হেসে বললাম, 'হয় তো তাই।'

'কেন, এতে ভাববার কি আছে? আজ রাত্রে তুমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ যা তোমার কাছে নতুন. তাই নিয়েই লেখ কিছু।'

'ঠিক বলেছ মরিণ,' আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম. 'কিন্তু আমি লিখবো বাংলা ভাষায়, সে তো তুমি বুঝবে না।'

'ইংরেজিতেই লেখ না, তুমি তো বেশ ইংরেজি জানো।'

রাত্রি গড়িয়ে চলেছে আর আমার কলমও সেই গতিতে ছুটছে। বিস্ময়ের পালা শেষ করে এখন মেতেছি কৌতুকে। ভুলে গেছি এত রাতে আমার ঘরে সোহোর মেয়ে, আমার ঘরের সামনের পাশের ও ওপরের ঘরগুলিতে অসংখ্য ভাড়াটে; বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি অনেক সময়ে অনেক রাত অবধি ঘুম না এলে ওপর থেকে নেমে আসে বাইরের দরজা বন্ধ আছে কি না দেখতে, আর সেই দরজার পাশেই রাস্তার ওপর আমার ঘর। ভুলে গেছি যত আস্তেই কথা বলি না কেন, ফিস-ফিস স্বরে কথা বললেও নিঃস্তব্ধ রাতে তার গুঞ্জন শোনা যায় বাইরের দেয়ালে বা দরজায় কান পাতলে।

মরিণ সামনের সোফায় বসেছিল। আগ্রহ আর কৌতূহল উপচে উঠছে তার চোখের নীল তারায়।

এক সময়ে আমার পাশে এসে সে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ল লেখার ওপর আমাব কাঁধে ভর দিয়ে। আমার চুলগুলি নিয়ে সে খেলা করতে লাগল।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আঃ, এ রকম করলে আমি লিখতে পারবো না।'

সে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বল হয়ে বললে, 'তাহলে তুমি সাহিত্যিকই না!'

'বয়স তোমার কত খুকী?'

'মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই।'

আবার সে সোফায় গিয়ে বসল।

আমি লেখা শেষ করে বললাম, 'শোন মরিণ, তোমাকে নিয়েই একটা গল্প লিখলাম। তুমি এর নায়িকা।'

তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

'শোনো গল্পটা।' আমি তাকে লেখাটি পড়ে শোনালাম।

শোনার পরে সে বললে, 'এ কি, গল্পের শেষ কই ?'

'শেষ হয় নি। শেষ হবে কাল তুমি চলে যাবার পর।'

'তবে আমি শেষটা জানবো কেমন করে ?'

বললাম, 'তা ঠিক, তোমার সঙ্গে তো আর আমার দেখা হচ্ছে না।'

মরিণ বললে, 'তাতে অসুবিধা কি ? আজ আমায় যেখানে পেয়েছ সেখানেই কালও পাবে।'

'তা আমি জানি মরিণ', আমার গলা একটু ভারী হয়ে উঠল, 'কিন্তু আমি আর চাই না তোমার সঙ্গে দেখা করতে !'

মরিণ আহত সুরে বললে, 'কেন, আমাকে তোমার ভাল লাগে নি ?'

'ভাল লেগেছে বলেই আমি চাই না একে প্রশ্রয় দিতে।'

মরিণ চুপ করে রইল, কিন্তু তার চোখের নীল তারা কি জলে চিক্ চিক্ করে উঠল ? হয় তো আমার দেখার ভুল !

আমি বলে চললাম, 'তোমার মতো মেয়ের সান্নিধ্যে এর আগে আসি নি কখনো। অর্থাৎ তোমার মতো যারা পণ্যা। তোমাদের সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত আমি ধারণাও করতে পারি নি যে, তোমাদের মধ্যে তোমার মতো এমন আশ্চর্য মেয়ে থাকতে পারে। আজ রাত্রে আমি পেলাম পরম এক অভিজ্ঞতা। এ রাত্রির কথা আমি ভুলবো না, তাই, আমার গল্পের মধ্যে আমি তোমাকে জীবন্ত করে রাখবো।'

মরিণ এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে শুনছিল, আমি থামতে সে মৃদুস্বরে বললে, 'তোমাকে একটা কথা বলবো ? শুনলে তুমি অবাক আর খুশী হবে !"

বললাম, 'আর কোনো কথা নয়।" তাকে কাছে টেনে নিলাম।

পরদিন সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন সূর্যের আলো জানালার বন্ধ শার্সির ওপর ঢাকা মোটা পর্দার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। আমি উঠে বসলাম।

মরিণ কখন চলে গেছে জানি না। হয় তো খুব ভোরে রাস্তায় লোক চলাচল হবার আগেই। তার কথা মনে হতেই উঠে পড়লাম। জানালার পর্দা সরিয়ে দিতেই আলোয় ঘর গেল ভরে।

টেবিলের কাছে এসে গত রাত্রের লেখা গল্পটি তুলে পড়তে শুরু করলাম।

বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি যেখানে আমার লেখা অসমাপ্ত অবস্থায় শেষ হয়েছে, তারপর থেকে কয়েকটি লাইন লেখা। অপরিচিত মেয়েলি হাতের বাঁকা বাঁকা অক্ষর।

"আমি জানতাম না যে, সেও একজন লেখিকা, গণিকা নয়। সে রাত্রে সেও বেরিয়েছিল আমার মতো রাতের সোহোর রূপ দেখতে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। বিচিত্র এক রূপ আর বিচিত্রতর আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতায় সে রাত্রি আমার সকল প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে অনন্য হয়ে রইল। আমরা ক্ষণিকের দৈহিক সুখের বিনিময়ে সে রাত্রে চিরকালের জন্যে দুটি অমূল্য হৃদয়ের সওদা করে হারিয়ে গেলাম, মিলিয়ে গেলাম জনারণ্যে!"

তার মৃদু কণ্ঠস্বর কানে বাজলো, 'তোমাকে একটা কথা বলবো? শুনলে তুমি অবাক আর খুশী হবে!' নিজের পরিচয়ই কি সে দিতে চেয়েছিল!

টেবিলের ওপর পেপার ওয়েটের তলায় চাপা এক পাউণ্ডের দশখানি নোট। আমি মরিণকে দিয়েছিলাম যখন সে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসতে রাজী হয়।

সেই রাত্রেই ছুটে গেলাম সোহো পল্লীর সেই গলিতে, যেখানে আগের রাত্রে মরিণের দেখা পেয়েছিলাম। কত পথ কত অলি-গলি রাতের পর রাত অধীর উত্তেজনায় প্রত্যাশায় মরিণের খোঁজে ঘুরেছি!

আর কোনোদিন তার দেখা পাই নি!

ওলগার প্রেম

ক্লাবটির নামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক গন্ধ আছে তাই সেখানে ভিড় কন্টিনেন্টের মেয়ে পুরুষের। খাঁটি ইংরেজ খুব কম। সেখানে আমরা গিয়ে থাকি। আমরা অর্থাৎ আমি, বাণীকণ্ঠ, অজয় প্রভৃতি। সপ্তাহে হু'দিন করে বৈঠক বসে, আলোচনা হয়, গান বাজনাও থাকে। সন্ধেটা সেদিন ভালোই কাটে। চাঁদার অঙ্কটাও কম আর ভিনদেশীয় মেয়েদের যাতায়াত থাকায়, বলা বাহুল্য, ভিড় ঠেকানো দায় হয়ে পড়ে!

এ হেন দেশে এ হেন ক্লাবে এক নাগাড়ে হু'মাস সভ্য হয়ে থেকেও আজ অবধি কোনো বান্ধবী জোগাড় করতে পারল না বাণীকণ্ঠ। চাঁদার পয়সাটাই মাস মাস গুণতে হয় আর আশায় আশায় হাজিরা দিতে হয়—আজ যদি কেউ ভুলেও বাণীকণ্ঠের প্রতি সদয় হয়।

ক্লাবের সভ্যা ওলগার সঙ্গে ভলগা নদীর বাস্তবিক কোনো সাদৃশ্য আছে কি না জানি না, কিন্তু ওলগা দেখতে মোটাই। তার ওপর এ দেশের মেয়েদের উচ্চতার তুলনায় বেঁটে। মুখশ্রী কিন্তু ভালো।

কিন্তু চেহারা যাই হোক মেয়েটি কথাবার্তায় বেশ পটু। তাই তার পুরুষ বন্ধুর অভাব হয় না। তাকে হালকা স্বভাবের মেয়ে মনে করলেও তার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে সকলের।

সেদিনো সন্ধের সময়ে আমরা ক্লাবে উপস্থিত ছিলাম। একটু আগে পিয়ানোতে এক ভদ্র মহিলা শুবার্টের কয়েকটি সোনাটা বাজিয়ে শোনালেন। বাজনার আসর ভেঙে যাওয়ার পর এখন তাই নিয়েই আলোচনা চলছে। ভদ্র মহিলার চমৎকার হাত পিয়ানোতে। সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ

সেদিন ক্লাবে ঢোকার সময়ে অজয় ও আমার কাছে বাণীকণ্ঠ প্রতিজ্ঞা করেছিল---আজ সে একা বেরোবে না ক্লাব থেকে। সঙ্গিনী নিয়েই বেরোবে। একটা কঠিন শপথও সে করেছিল।

শুনে বলেছিলাম, 'দেখ, এই রকম প্রতিজ্ঞা করা কি ঠিক হবে? সঙ্গিনী কাউকে নাই পাও তাহলে করবে কি? রাত্রে তো আর ক্লাবে থাকতে পারবে না! এটা তো আর রেসিডেন্সিয়াল ক্লাব নয়!' সে আমার কথার অন্তর্নিহিত বিদ্রূপটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলে নি। বাণীকণ্ঠের প্রধান গুণ সে রাগতে জানে না।

আজ তাই সকলকে অবাক করে বাণীকণ্ঠ ওলগাকে নিয়ে পড়ল। দু'জনেই পুরোনো সভ্য সভ্যা, কাজেই আলাপ চলতে লাগল।

আমি বললাম অজয়কে, 'আজ বাণীকণ্ঠ কামাল করবে দেখবি। ওলগাকে নিয়েই বেরোবে মনে হচ্ছে!'

অজয় বড় অবিশ্বাসী বাণীকণ্ঠ সম্বন্ধে, বললে, 'দেখই না শেষ অবধি।'

ওলগা ও বাণীকণ্ঠ আমাদের কাছ থেকে হাত কয়েক দূরেই বসেছিল। দেখলাম সিগারেট প্যাকেট বার করে ওলগার সামনে ধরল বাণীকণ্ঠ। ওলগা স্মিত হেসে 'থ্যাঙকু' বলে একটা টেনে নিল।

এরপর আলাপ জমতে দেরী হল না। শুনতে পেলাম বাণীকণ্ঠ বলছে ওলগাকে, 'তোমার পিয়ানো কি রকম লাগল?'

'চমৎকার'! ধোঁয়া ছেড়ে ওলগা বললে।

'শুবার্ট আমার প্রিয় কম্পোজার।' বাণীকণ্ঠ গান বাজনা বোঝে, পিয়ানোও বাজাতে পারে একটু-আধটু।

ওলগা বললে, 'ও বেটোফেনের মতো কেউই নয়।' বলে এক কথায় বেচারা শুবার্টকে নাকচ করে দিল। বুঝলাম তার কাছে শুবার্টও যা বেটোফেনও তা। নামগুলিই জানা আছে।

এরপর আলোচনার মোড় ঘুরল। বাণীকণ্ঠই ঘোরাল সংগীত

শাস্ত্রে ওলগার ব্যুৎপত্তি আঁচ করে। বললে, 'আজ সারাদিন কি বিশ্রী পিচ পিচ বৃষ্টি হচ্ছে, দেখছ ?'

ওলগা বৃষ্টির নাম শুনেই নাক সিঁটকোল।

বাণীকণ্ঠ বললে এবার, 'চা খাবে ?'

'আপত্তি নেই।' ওলগা নিরাসক্ত।

ঘরের মধ্যে একপাশে চা কফি ও প্যাস্ট্রি প্রভৃতি একটা বড় টেবিলের ওপর সাজানো। কাপে চা ঢালছে জেন, ক্লাবেরই মেয়ে। বাণীকণ্ঠ উঠে গেল তার কাছে।

বাণীকণ্ঠ ওখান থেকে হাঁকল, 'চা না কফি ?'

ওলগা বললে, 'যা হয়।'

'আর কিছু ?'

'না, থ্যাঙক্স্।'

বাণীকণ্ঠ জোর করে, 'না কেন, হয় প্যাস্ট্রি নয় স্যাণ্ডউইচ যা হোক ল।'

বাণীকণ্ঠ একটা কিছু না খাইয়ে ওলগাকে ছাড়বে না।

ওলগা বাণীকণ্ঠর অনুরোধ ঠেলতে পারল না। বললে, 'তবে নিয়ে এসো যা হয়।'

বাণীকণ্ঠ ছু'কাপ কফি ও ছুটো করে প্যাস্ট্রি দাম দিয়ে নিয়ে এল।

এর পর ওদের আলাপ আরো যেন ঘন হল। বাণীকণ্ঠ তার চেয়ারটা ওলগার চেয়ার ঘেঁষে টেনে নিল। ওদের কথাবার্তাও আর শোনা গেল না, এমনি মৃছ।

রাত গড়িয়ে দশটার দিকে যেতেই ক্লাবের সেক্রেটারী একবার আলো নিভিয়ে সিগন্যাল দিলেন, অর্থাৎ এবার উঠতে হবে। সকলে উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। টিউবের চেয়ারগুলি টেনে টেনে জড়ো করল কয়েকজন মিলে। বাণীকণ্ঠও হাত লাগাল।

বাণীকণ্ঠকে জিগ্যেস করলাম, 'ওর সঙ্গে বেরোচ্ছ না কি ?'

'নিশ্চয়ই।' বাণীকণ্ঠ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অজয় বললে, 'ডিনার খেতে নিয়ে যা।'

কিন্তু বাণীকণ্ঠ অত সহজে পয়সা ফেলবার ছেলে নয়। বললে, 'দেখি।'

অজয় বললে, 'দেখি কি! তোর যে রকম বরাত! এর পর কে আবার সঙ্গ নেবে! যা, বল ডিনারের কথা!'

ওলগা কাছে এসে বললে. 'আমি ক্লোক রুমে যাচ্ছি কোট আনতে।'

বাণীকণ্ঠ বললে, 'চল আমরাও যাবো কোট নিতে।'

বাণীকণ্ঠর ভাব দেখে মনে হল আজ সে একা ছাড়বে না ওলগাকে। আমাদের বললে, 'ওকে না নিয়ে আজ বেরোবো না বলেছি তো।'

নীচে বেসমেণ্টে ক্লোক রুম থেকে যে যার কোট নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। ওপরে এসে দেখি বেরোবার দরজার কাছে ওলগা কয়েকটি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে।

আমাদের পিছন পিছন আসছিল জন। তাকে দেখে ওলগা বললে. 'তুমি বড় দেরী করো। ভীষণ অন্যায়।' তারপর বাণীকণ্ঠর দিকে তাকিয়ে বললে, 'গুড নাইট বাণীকাণ্টা। আবার দেখা হবে।' বলে সে সেই দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

তার চলে যাবার পর বাণীকণ্ঠর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরাও বেরোবো কি না ভাবতে লাগলাম।

এ হেন ওলগা একদিন আমারও সঙ্গিনী হল।

সেদিন ক্লাব ঘরে নীচের লাউঞ্জে বসে একটি পত্রিকা ওল্টাচ্ছিলাম। ঘরে আরো কয়েকজন বসেছিল। ওপর তলায় তখন চলছে একটি বক্তৃতা।

উঠবো ভাবছি এমন সময়ে ওলগা এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে বললে, 'ওপরে বুঝি বক্তৃতা চলছে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, 'ফাউণ্ডেশানস অব পিস' সম্বন্ধে বক্তৃতা।'

ওলগা একটা সোফায় বসে পড়ল। তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আজ সাজটাও ভাল করে নি।

বললাম, 'ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোমাকে?'

'ক্লান্তই। ক্রয়ডনে যেতে হয়েছিল সেই সকালে। সেখান থেকেই ফিরছি।'

আমি আর কোনো কথা না বলে পত্রিকায় চোখ মেললাম।

ওলগাও একটা কাগজ টেনে নিল। তারপর বললে, 'বহুকাল পরে তোমাকে দেখছি!'

'এক বছর প্রায়। একটা ইভনিং ক্লাশে যোগ দিয়েছিলাম। এক বছরের কোর্স একটা।'

'উঁ?' আমার কথা বোধ হয় শুনতে পায়নি সে। তাই বললাম, 'আজ তোমায় একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে যেন?'

'অন্যমনস্ক? কই না তো? মনে হচ্ছে কি?'

'হচ্ছে বৈ কি?'

'তা হবেও বা।' ওলগা উঠে কোণের দিকের বই ভর্তি আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ বইগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে তারপর মন্থর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বললাম, 'চললে না কি?'

'ভাবছি যাবো এবার।'

'এই এসে চলে যাবে?'

'বাড়ী যেতে হবে।'

আমিও উঠে পড়লাম। আজ সকাল সকাল আমারও বাড়ী যাবার দরকার ছিল। দু'জনেই বেরিয়ে পড়লাম এক সঙ্গে।

'কোন দিকে যাবে তুমি?' আমি জিগ্যেস করলাম বেরিয়ে এসে।

সে বললে, 'এজওয়ার রোডে আমার বাড়ী।'

'এজওয়ার রোডে? আমিও তো ঐ দিকে যাব। প্যাডিংটনে। চল, তাহলে এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।'

আমরা বড় রাস্তায় এসে বাস ধরলাম।

চুপচাপ বসেছিলাম পাশাপাশি। ওলগাকে নীরব দেখে বললাম, 'ওলগা, ব্যাপার কি? কোনো দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে নাকি!'

একটু চুপ করে থেকে সে বললে, 'ক'দিন থেকে একটা গুরুতর রকমের সমস্যায় পড়েছিলাম, সমাধান করতে পারছিলাম না। আজই সমাধান করে ফেললাম, তাই মনের মধ্যে তার জেরটা এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে।'

বললাম, 'মানুষের জীবনটাই তো একটা বিরাট সমস্যার বিষয়।'

ওলগা বললে, 'আমার জীবনে এতবড় সমস্যা এই প্রথম। তাই খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।'

বললাম, 'অবশ্য আমার জিগ্যেস করা উচিত নয়, তবু এত কথা যখন বললে, তখন তোমার সমস্যার কথা নিতান্তই যদি গোপনীয় না হয়, তবে বলতে আপত্তি আছে তোমার?'

'আপত্তি! না আপত্তি কিসের! বরং কাউকে বলতে পারলে যেন মনটা হাল্‌কা হয়। বিশেষ করে তোমাকে। কারণ আমি জানি তুমি বিষয়টাকে তার যথাযথ গুরুত্ব দেবে।'

আমি চুপ করে রইলাম ওলগার কথা শোনবার জন্যে।

সে বললে, 'কিন্তু সেন, এত কথা তো এই বাসে বসে হবে না; পথেও না। তার চেয়ে চল আমার বাড়ীতে। সেখানেই বলবো সব। যাবে?'

'যাবো।'

বাস থেকে নেমে এজওয়ার রোড ধরে এগোলাম আমরা।

ওলগা বললে, 'আমার কথাগুলো শুনে কতখানি গুরুত্ব দেবে জানি না। যদি না দাও তবে দুঃখ করবো না। কারণ জানি তোমরা আমাকে হালকা চটুল স্বভাবের মেয়ে বলেই মনে করো।'

অবাক হয়ে তাকালাম তার দিকে। কি উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না তার এই কথায়।

পরক্ষণে সে নিজেই বললে, 'অবশ্য তোমাদের দোষ নেই। আমি যা তাই তো তোমরা জানবে!'

এ কথা বলছ কেন ওলগা? তোমাকে—'

'থাক।'

চুপ করে গেলাম। অনর্থক মিথ্যে কথা আমিও চাই নি বলতে। খানিকটা চলার পর ওলগা বললে, 'কিন্তু জীবনে এমন সময় তো কখনো আসে যখন মানুষের স্বভাবেরও পরিবর্তন হয়। তুমি বিশ্বাস করো এ কথা?'

'বিশ্বাস করি।'

শুনে সে খুশী হয়েছে মনে হল। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলাম।

ওলগা বললে, 'আমাদের দেশে এই 'কালার বারটা' সত্যিই মারাত্মক। গায়ের রং আমাদের কাছে মানুষের মনুষ্যত্বকে ঢেকে রেখে দেয়।'

সে বলে চলল, আমি শুনতে লাগলাম চলতে চলতে। 'আমি একজনকে ভালবাসি। ভালবাসা কি তা আমি জেনেছি তার কাছেই! কিন্তু তার মস্ত অপরাধ তার গায়ের রং আমার মতো সাদা নয়। তাই আমাদের সমাজের বিচারে সে আমার ভালবাসা পাবার উপযুক্ত নয়। কি অদ্ভুত কথা, তাই না সেন?'

জিগ্যেস করলাম, 'সে কি ভারতীয়?'

'আফ্রিকান। আমরা বলি নিগ্রো।'

চেয়ে দেখলাম ওলগার দিকে, রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের আলো এসে পড়েছে তার মুখের ওপর। সেই দিকে তাকিয়ে এই প্রথম মনে হল ওলগা অত্যন্ত সুন্দরী।

'আমরা এসে গেছি।' সে থেমে গেল একটি বাড়ীর সামনে এসে। তার ব্যাগ থেকে 'ল্যাচকি' বার করে দরজা খুলল। বললে, 'সামনের প্যাসেজটা অন্ধকার। আমার হাত ধরো। নইলে হোঁচট খাবে কোথায়!'

তার হাত ধরে সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম খানিকটা অন্ধের মতন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম দোতলায় তার সঙ্গে। দোতলার একটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে চাবি দিয়ে দরজা খুলল।

ঘরে আলো জ্বলছিল, দেখলাম একটি চেয়ারে বসে আছে একজন আফ্রিকান যুবক।

'এ আমার আমার ক্লাবের বন্ধু সেন, আর এ হল জর্জ। যার কথা তোমাকে বলছিলাম।'

পরিচয় হতেই হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলাম জর্জের সঙ্গে।

জর্জ বললে, 'ওলগা, তুমি সকালে আমাকে ফোন করে বেরিয়ে গেলে, তারপর সারাদিন তোমার খোঁজ নেই। এখানে এসেছি আধঘণ্টা হল। কি দুশ্চিন্তাতেই না কেটেছে সমস্তক্ষণ!'

ওলগা, 'ডুপ্লিকেট চাবি পেয়েছিলে তাহলে ল্যাণ্ডলেডির কাছে?'

জর্জ বললে, 'কোথায় ছিলে সারাদিন?'

'ক্রয়ডনে যাচ্ছি ফোনে সে কথা তো বলেই গেছিলাম। সেখান থেকেই ফিরছি।'

তারপর বললে, 'মাসীমা মেশোমশায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। তাঁরা গেছিলেন ব্রাইটনে। বিকেলে ফিরে এলেন। আমি তারপর আর মাত্র কয়েক মিনিট ছিলাম সেখানে।'

'কি হল সেখানে? তুমি বলে এসেছ তো তাঁদের যে, তুমি আর আমার সঙ্গে মিশবে না? আমার কথা মতো বলে এসেছ। সে কথা?'

'আমার সে কথা বলতে বয়ে গেছে!'

'তবে? তবে কি বলে এলে! জানোই তো তাঁরা পছন্দ করেন না যে আমার সঙ্গে মেলামেশা কর তুমি। তিনি তোমার আপন মাসীমা, আপনার জন। তাঁদের কথা মতো চলবে সে কথা বলনি তুমি?'

'বললাম তো, সে কথা বলতে আমার বয়ে গেছে!'

'কি বলে এলে তবে?' জর্জ বিস্মিত হয়ে তাকাল ওলগার দিকে।

'বলে এলাম, যাকে আমি সেদিন তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলাম

আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে, যার সঙ্গে তোমরা একটা কথাও বল নি, সে শুধু 'নিগ্রো' বলেই অপমান করলে, তাকেই—' ওলগা থামল।

'তাকেই কি ?'

'তাকেই বিয়ে করছি আমি।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওলগার দিকে। দেখলাম জর্জও কম অবাক হয় নি আমার চেয়ে। সে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল ওলগার দিকে। সে যেন এ কথা শোনবার আশা করে নি।

ওলগা আমাদের বিস্মিত ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বললে, 'তোমরা হু'জনেই বোবা হয়ে গেলে না কি ?'

জর্জ বললে, 'তুমি তোমার মাসীমাকে বলে এলে যে তুমি আমাকে বিয়ে করছ !'

'হ্যাঁ, তাই তো বলে এলাম। কেন, তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না ?'

জর্জ বললে, 'এ কথা তাঁদের বলবার আগে তুমি নিজে কি ভেবে দেখেছ ভাল করে ? ঝোঁকের মাথায় যে কথা বলে এলে সে কথার মানে কি তুমি বোঝ ওলগা ?'

'বয়স আমার কম নয় জর্জ। ছোট খুকীটি নই ! বিয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দেবো না তো জীবনের আর কোন ব্যাপারে গুরুত্ব দেবো বলতে পারো ?'

তারপর এক মুহূর্ত থেমে বললে, 'কিন্তু মাসীমাদের কথা বলার পর থেকে আমার মন চঞ্চল হয়ে আছে। কেবলই ভাবছি তুমি আমাকে বিয়ে করবে তো ? তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না !'

জর্জ বললে, 'আমার মনের কথা তোমার অজানা নয় ওলগা! কিন্তু এ যে আমি ভাবতেও পারি নি! আমাকে বিয়ে করার মানে— তোমার নিজের দেশ, সমাজ, আত্মীয়-বন্ধু সব হয় তো ছাড়তে হবে! হল্যাণ্ডে তোমার যেটুকু পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাও হয় তো পাবে না আর! পারবে সব ছাড়তে আমার জন্য ?'

'না পারলে বলে এলাম কি করে ? যাক সে সব কথা। সেন,

আমাদের এই সব ঘরোয়া মামুলী কথাবার্তা শুনতে তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগছে না! জর্জ, এখন এ সব কথা থাক। এস, চা বানাই। তারপর চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে। কি বল সেন?'

আমি ওলগার দিকে চেয়ে রইলাম শুধু। আজ তাকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম! এতখানি মনুষ্যত্ব, এতখানি মাধুর্য, এমন আশ্চর্য মানসিক দৃঢ়তা তার ঐ চেহারার মধ্যে লুকিয়ে ছিল কেমন করে!

জর্জ বললে, 'সত্যি, আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে মিঃ সেন। আপনার সামনে এতক্ষণ নিজেদের ব্যক্তিগত কথা নিয়েই আলোচনা করেছি। আমাদের ক্ষমা করবেন।'

বললাম, 'আজকের ঘটনা আমি কখনো ভুলবো না মিঃ জর্জ।'

জর্জ আমার কথা বুঝতে পারল কি না জানি না, কিন্তু কিছু বলল না। ওলগা তখন গ্যাসের রিং জ্বালাতে ব্যস্ত ছিল চায়ের জল বসাবার জন্যে—আমার কথা তার কানেও হয় তো যায় নি।

জর্জ ও ওলগার সঙ্গে গল্প করে অনেকক্ষণ পরে যখন নেমে এলাম নীচে, ওলগাও সঙ্গে এল। অন্ধকার প্যাসেজটা হাত ধরে আগের মতই পার করে দরজার বাইরে এসে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বললে, 'মাঝে মাঝে আসবে তো এখানে?'

ল্যাম্প পোস্টের আলো পড়েছিল সেখানে। সেই আলোয় তাকে অপরূপা মনে হলো!

তার হাতটা তখনো ধরা ছিল আমার হাতে। সস্নেহে তার হাতে একটু চাপ দিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই আসবো ওলগা! আর চিরদিন কামনা করবো তোমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাক। তোমরা দু'জনে সুখী হও।'

ওলগা গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'তোমাকে অনেক—অনেক ধন্যবাদ প্রিয় বন্ধু।'

ক্যারোলাইন

প্রায় রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়।

ফিন্‌স্‌বেরি পার্ক টিউব ষ্টেশন থেকে আমি উঠি, আর সে ওঠে পরের ষ্টেশন আর্সেনাল থেকে। একই টিউবে, একই সময়ে আমরা যাই। হোবর্ণ ষ্টেশনে ট্রেন বদল করে ধরি সেন্ট্রাল লাইন টটেনহাম কোর্ট রোডের জন্যে। তাই তার সঙ্গে দেখা হয় টিউবে, প্ল্যাটফরমে, ওঠা নামার সময়ে এস্‌কালেটারে। টটেনহাম কোর্ট রোড ষ্টেশন থেকে সে বেরিয়ে যায় লেস্টার স্কোয়ারের দিকে, আমি অক্স্‌ফোর্ড সার্কাসের রাস্তা ধরি।

সে সুন্দরী : কাঁধ অবধি নেমে এসেছে লাল কোঁকড়ানো চুল, টানা দু'টি চোখ, টিকলো নাক, যৌবনপুষ্ট দেহ। দেখলে ইংরেজ বলে মনে হয় না। কন্টিনেন্টের ছাপই বেশি চেহারার মধ্যে।

একদিন তার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হয়ে গেল।

টটেনহাম কোর্ট রোডের ওপরেই এক ভারতীয় রেস্তোরাঁ। মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম মুখ বদলাতে আর মুখরোচক দিশী রান্নার স্বাদ গ্রহণ করতে। সেদিনও সন্ধের সময়ে উপস্থিত হলাম সেখানে।

ঢুকে দেখি এক কোণের টেবিলে বসে সে খাচ্ছে।

রেস্তোরাঁয় তখনো ভীড় জমেনি। ডিনারের জন্যে লোকের আসা শুরু হয়নি। তাই একেবারে ফাঁকাই ছিল। আমাকে দেখে মেয়েটি একবার তাকাল আমার দিকে। সে যে আমাকে চিনতে পেরেছে বুঝতে পারলাম তার মুখ চোখ দেখে।

রেস্তোরাঁর মালিক সহাস্য মুখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। সিলেটের বাঙালী মুসলমান, সিলেটি টানে কথা বলেন। আমাকে দেখে বললেন, "আসুন স্যার, অনেক দিন পরে এলেন!"

হেসে বললাম, "মহম্মদ সাহেব, এখানে এসে আপনার সুস্বাদু খাবার শুধু শুঁকতে গেলেই অনেক খরচ হয়ে যায়, পেট ভরে খাওয়া তো দূরের কথা! খদ্দেরের পেট ও পকেট এক সঙ্গে কি করে খালি রাখা যায়—এ কৌশল আপনি অবশ্যই জানেন।"

মহম্মদ সাহেব হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, "কি যে বলেন স্যার! অন্যান্য জায়গার তুলনায় আমার এখানে দাম তো অনেক কম। বিশ্বাস করুন।"

আমি তেমনি হেসে বললাম, "যাক, আজ আমি ভাবছি না। আজ মাইনে পেয়েছি; আর, একটা পয়সাও খরচ না করে সোজা এখানে চলে এসেছি আপিস থেকে। অতএব আজ ভাল করে খেতে পারবো।"

মহম্মদ সাহেব কাউন্টারে দাঁড়ানো সুশ্রী ওয়েট্রেসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্যাট, অতিথি সৎকার করো।"

প্যাট অর্থাৎ প্যাট্রিসিয়া আমাকে চিনতো। সে স্মিত হেসে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, বললে, "গুড ইভনিং স্যার।"

প্যাট্রিসিয়া অর্ডার নিয়ে চলে যেতে আমি সেই মেয়েটির দিকে তাকালাম। তখন তার খাওয়া হয়ে গেছে, অন্য এক ওয়েট্রেসকে বিলের টাকা দিচ্ছিল। আমি এবার হলের চারপাশে চোখ বুলিয়ে সামনের দিকে তাকালাম, দেখি সে আমার টেবিলের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে একবার ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে আবার এগোল দরজার দিকে। তার হাতে কয়েকটা বই ও নোট বুক।

দরজার কাছে বসেছিলাম। তার ঐ ভাব দেখে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "এক্সকুজ মি, আমাকে কিছু বলবে?"

সে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর কাছে এসে বললে, "তুমি কি করে বুঝলে?"

"তোমার ভাব দেখে।"

"ভাব দেখে মনের কথা বোঝার ক্ষমতা আছে তোমার!"

আমি হাসলাম।

"যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা প্রশ্ন করবো ?"

"একটা কেন, তুমি একশোটা প্রশ্ন করো, আমি তার দু'শোটা জবাব দেবো, কথা দিচ্ছি। বসো।"

সে আমার সামনের চেয়ারে বসল, আমার কথায় তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেখলাম।

"ছাত্রী বুঝি ?"

সে বললে, "ছাত্রী নই, আপিসে কাজ করি।" তারপর এক মুহূর্ত পরে বললে, "তুমি তো বাঙালী ? তাই না ?"

অবাক হয়ে বললাম, "কি করে বুঝলে ?"

"তোমার ভাব দেখে নয় অবশ্য," সে হেসে বললে, "তোমার ও রেস্তোরাঁর মালিকের কথা শুনে।"

"অর্থাৎ তুমি বাংলা জানো ?"

"জানি না। তবে শুনলে বুঝতে পারি বাংলায় কথা হচ্ছে।"

"খুব ইন্টারেস্টিং। তোমাকে আমি প্রায় রোজই দেখি !"

মেয়েটি হেসে বললে, "হ্যাঁ, আমরা পরস্পরের খুব পরিচিত।"

আমিও হাসলাম। বললাম, "তাহলে পরিচয়টা এবার পাকা করা যাক।" নিজের নাম বললাম।

সে তার নাম বললে, "ক্যারোলাইন কার্টার।"

বললাম, "ইংরেজ তাহলে। আমি মনে করতাম কন্টিনেন্টাল।"

সে অবাক হয়ে বললে, "কিসে তোমার ধারণা হল আমি ইংরেজ নই ?"

"তোমার সৌন্দর্য দেখে।"

"ভগবান! তুমি কি কখনো সুন্দরী ইংরেজ মেয়ে দেখনি ? ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে কি সৌন্দর্যের অভাব আছে ?"

"সুন্দরী ইংরেজ মেয়ে রোজই দেখি। সে কথা নয়, তবে তোমার চেহারার মধ্যে কি যেন আছে যাতে আমার ঐ রকম ধারণা হয়েছিল। যাক সে কথা, তোমার কি প্রশ্ন ছিল বল।"

"আমি বাংলা শিখছিলাম, তারপর মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গেল কোনো কারণে। কিন্তু শেখার ইচ্ছা যায়নি, আবার শুরু করতে চাই। তুমি বাঙালী, তাই কোন বই পড়লে বাংলা শেখা সহজ হবে—সে বই-এর নাম যদি বল, তাহলে আমি সেই বই যোগাড় করে পড়বার চেষ্টা করতে পারি।"

জানতে ইচ্ছে করল কেন হঠাৎ বাংলা শিখছিল সে। কেনই বা মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গেল। আর কেনই বা আবার সে শুরু করতে চায়। কিন্তু এ সব প্রশ্ন করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ। তাই একটু ভেবে বললাম, "বিদেশীর পক্ষে এ দেশে বাংলা শেখার বই পাওয়া কঠিন।"

ক্যারোলাইন বললে, "কেন, হিন্দী শেখবার সহজ বই তো এখানে দেখেছি। বাংলা শেখার সে রকম বই নেই?"

বললাম, "অন্তত আমি দেখিনি এ দেশে।"

ক্যারোলাইন একটু নিরাশ হয়েছে মনে হল।

আমার খাবার ট্রেতে করে নিয়ে এল প্যাট্রিসিয়া। সেগুলি সে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল।

ক্যারোলাইনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি নেবে?"

"ধন্যবাদ। আমাকে তো এখুনি খেতে দেখলে।"

"কিছু নাও। আইসক্রীম, কফি?"

সে হেসে বললে, "কফিই নেবো তাহলে।"

প্যাট্রিসিয়া হেসে চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কতদূর শিখেছিলে বাংলা?"

"সামান্যই। বাঁধা ধরা ব্যাকরণ সম্মত কিছু না। কয়েকটা চলতি কথা মাত্র।"

বুঝতে পারলাম তার কোনো বাঙালী বন্ধুর কাছে বাংলা শিখছিল সে।

"তাহলে শেখা সম্ভব নয় দেখছি।" সে বললে।

"খুব সম্ভব।"

"কি করে? সে রকম কোন বই আছে তোমার?"

"আমি আছি। আমার কাছে বাংলা শিখতে আপত্তি আছে তোমার?"

সে বললে, "তুমি কেন আমার জন্যে পরিশ্রম করবে? সময় নষ্ট করবে?" একটু থেমে বললে, "অবশ্য এর জন্যে যদি কিছু পারিশ্রমিক নাও, তাহলে খুশী হয়েই শিখবো তোমার কাছে।"

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "পারিশ্রমিক আমি চাই না। আমার মাতৃভাষা একজন বিদেশী শিখবে এটাই আমার আনন্দ।"

ক্যারোলাইন কিছু না বলে হাসল একটু।

আমি বললাম, "একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"আমি জানি কি জিজ্ঞেস করতে চাও।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কি বল তো?"

"বাংলা ভাষা ও বাঙালার সম্বন্ধে এত আগ্রহ কেন, এই তো জানতে চাও?"

তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "ভাব দেখে মনের কথা বোঝার ক্ষমতা তোমারও আছে দেখছি।"

"এতে ক্ষমতার কিছু দরকার হয় না। এ তো এক স্বাভাবিক কৌতূহল।"

প্যাট্রিসিয়া কফি দিয়ে গেল। কাপে কফি ঢালতে ঢালতে সে বললে, "কফি খাবে তো?"

"ধন্যবাদ। আমি এই খাবার পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছি।"

বললাম, "আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি কিন্তু।"

সে বললে, "আমার বাংলা শেখার আগ্রহের কারণ তোমাকে বলবো দু' একদিন পরে।"

ফিনস্‌বেরি পার্ক থেকে আর্সেনালের কিলোমিটারের হিসাবে দূরত্ব বেশি নয়। সে দূরত্বও ঘুচে গেল সময়ের হিসাবে।

আমার বাড়ীতে এসে বাংলা শিখছে ক্যারোলাইন। সপ্তাহে দু'দিন করে সে আসবে ঠিক হয়েছে।

একটা শোবার ঘর, মাঝারি আকারের লাউঞ্জ ও সিঁড়ির শেষ ধাপে একটু খানি জায়গায় স্টোভ ও কাবার্ড নিয়ে ছোট কিচেন। তিন তলার ওপর আমার ফ্ল্যাট দেখে ক্যারোলাইন খুব খুশি. "বাঃ. কি চমৎকার ফ্ল্যাট তোমার।" সে বললে।

বললাম, "ভাগ্য ক্রমেই পেয়েছি এটা। আর সস্তায়। কত, সে কথা বলবো না। তোমার হিংসে হবে।"

"বল না, কথা দিচ্ছি, হিংসে করবো না।"

"সপ্তাহে দু'পাউণ্ড।"

"না!" ক্যারোলাইন যেন বিশ্বাস করতে চায় না। "তুমি ঠাট্টা করছ?"

"সত্যিই বলেছি।"

ক্যারোলাইন বললে, "তুমি অবশ্যই ভাগ্যবান, সন্দেহ নেই, অন্তত এ ক্ষেত্রে।"

ক্যারোলাইনকে যত দেখছিলাম, মুগ্ধ হচ্ছিলাম। কত সপ্রতিভ, অনাড়ম্বর। অল্পাদনের পরিচয়তেই আন্তরিক সহজ ঘনিষ্ঠতার ভাব। য়ুরোপীয় মেয়েরা মাত্রেই তাই। মানুষের সঙ্গে মেলা মেশায়, বিশেষ পুরুষদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। জন্ম থেকেই তারা পুরুষদের সঙ্গে বড় হয়। পুরুষদের সঙ্গে আলাপে ঘনিষ্ঠতায় কোনো প্রতিবন্ধক নেই, না পারিবারিক, না সামাজিক। সে জন্যে তাদের মধ্যে কথায় কথায় অনর্থ ঘটে না। দেখা মাত্র তারা প্রেমে পড়ে না পরস্পরের। অবাধ মেলামেশাতে, বন্ধুত্ব করলে কেলেঙ্কারী ঘটে না। পরস্পরকে দু'টি ভিন্ন জগতের জীব বলে মনে করে না।

তাই বিস্মিত হলাম না যখন ক্যারোলাইন বললে তাকে বাংলা শেখানোর পরিবর্তে সে আমার কিছু কাজ করে দিতে চায়।

বললাম, "কি কাজ তুমি করবে ক্যারোলাইন?"

"কত কাজ আছে করার। তুমি নিজে রান্না করো। আমি তাতে সাহায্য করতে পারি। সার্টের বোতাম লাগাতে পারি। গেঞ্জি রুমাল কেচে দিতে পারি। জামা কাপড় ইস্ত্রি করে দিতে পারি।"

"বাঃ বাঃ!" হেসে ফেললাম তার কথা শুনে।

"বিশ্বাস হল না বুঝি কথাটা?"

"বিশ্বাস হয়েছে, কিন্তু তোমাকে এ সব কিছুই করতে হবে না।"

"তবে আমিই বা তোমার কাছে বিনা পারিশ্রমিকে বাংলা শিখবো কেন? এতে আমার বিবেকে লাগে।"

"আমার ভাষা একজন বিদেশী শিখতে চাইলে তাকে শেখানো আমার কর্তব্য।"

ক্যারোলাইন হাসল একটু, বললে, "ধরো যদি কোনো পুরুষ শিখতে চায় তোমার কাছে, কর্তব্য বোধে তাকে শেখাবে তো?" তার ছ'চোখে দুষ্টুমির আভাষ।

আমি বললাম, "মানুষ স্বেচ্ছায় নীরস কর্তব্য করতে চায় না, কর্তব্যের সঙ্গে আনন্দ যদি না থাকে তো সে কর্তব্য তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে ওঠে। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে আনন্দ থেকেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আনন্দেই সমস্ত বাঁচে, আনন্দের পানেই সব চলে।"

ক্যারোলাইন মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল, আমি থামলেও সে কিছু বলল না। কিন্তু মনে হল সে যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

পরদিনই সে এল।

চা তৈরী করল নিজে, তারপর চা কাপে ঢালতে লাগল।

"তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।"

আজ তাকে প্রথম থেকেই গম্ভীর মনে হচ্ছিল। গতকালও সে যখন যায় তখনো তার এ ভাব ছিল। তাই তার কথা শুনে তাকালাম তার দিকে।

সে বললে, "আমি একজনের বাগদত্তা, সে কথা তোমাকে আগেই জানিয়ে রাখা ভাল। কারণ—"

বললাম, "তোমার আঙুলে তো 'এনগেজমেণ্ট রিং' নেই।"

"তা নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা এনগেজ্‌ড্‌ নেই। তবে আমাদের বিয়ে শিগগীরই হবে।"

আমি চুপ করে রইলাম। বুঝতে পারলাম ভাষা শেখার ভিতর দিয়ে পরস্পরের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা অবশ্যম্ভাবী, তার ফলে তার প্রতি কোনো দুর্বলতা আমার মনে যাতে বাসা না বাঁধে, তাই গোড়াতেই আমাকে সে সচেতন করে দিল।

আমাকে নীরব দেখে সে বললে, "কি ভাবছ?"

আমি তার দিকে তাকালাম, বললাম, "যখন তোমার বিয়ে শিগগীরই হচ্ছে, তখন বাংলা শিখে কি করবে?"

ক্যারোলাইন এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললে, "কারণ আমি একজন বাঙালীকে বিয়ে করছি, তাই বাংলা শেখার এই আগ্রহ।"

"বাঙালীকে? কে সে?"

"তার নামটা এখনই বলতে পারছি না। হয় তো তুমি তাকে চিনতে পারবে। তার ইচ্ছে, বিয়ের আগে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করবো না।"

"আমাকে বললে যে!"

"কাকে বিয়ে করছি তা তো বলিনি।"

আমি উঠে ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগুন নিভে আসছিল। আমি পোকার দিয়ে আরো কিছু কাঠ ভিতরে ঠেলে দিলাম।

ক্যারোলাইন উঠে আমার পিছনে দাঁড়াল।

আমি বললাম, "তার কাছেই কেন তবে বাংলা শিখছ না?"

"সে বর্তমানে এখানে নেই, দেশে গেছে ছুটিতে। তিন মাস পরে ফিরবে।"

"এখানে সে ছাত্র?"

"চাকরী করে। সে দেশ থেকে ফিরলে আমাদের বিয়ে হবে।"

"বিয়ের পরেও তো তার কাছে বাংলা শিখতে পারতে?"

"তা পারতাম।" এক মুহূর্ত থামল সে, তারপর বললে, "কিন্তু তার ফেরার আগেই আমি তার ভাষা কিছুটা শিখে নিতে চাই—যাতে বিয়ের পর প্রথম রাতে তার সঙ্গে তার ভাষাতে সামান্য কথাও বলতে পারি।"

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, একেবারে ক্যারোলাইনের মুখোমুখি। তার চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে বললাম, "ক্যারোলাইন, তোমার ভাবী স্বামী পরম সৌভাগ্যবান, তাকে আমার হিংসে হচ্ছে!"

দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল।

ক্যারোলাইন ভাষা শিখছে। তার উৎসাহের অভাব নেই। বরং সময় যত এগিয়ে আসছে তার ভাবী স্বামীর দেশ থেকে ফেরার, ততই তার উৎসাহ যাচ্ছে বেড়ে।

শুধু ভাষাই নয়! আমার কাছে সে শিখেছে বাংলা রান্না। এর মধ্যে লণ্ডনে যে ক'টি ভারতীয় অনুষ্ঠান হয়েছে, সব কটিতে আমি তাকে নিয়ে গেছি সঙ্গে করে। বাঙালী বন্ধুদের কাছ থেকে বাংলা গল্প উপন্যাস চেয়ে এনে তাকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র বহু কবিতাই তার মুখস্থ হয়ে গেছে!

ক্রীসমাস ইভের সমারোহে সমস্ত লণ্ডন শহর উজ্জ্বল, উচ্ছল। উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সমান তালে। পথে, প্রান্তরে, দোকানে, বাজারে, ঘরে ঘরে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। আলোয় আলোয় সারা শহর যেন প্লাবিত। সুপরিচিত ক্রীসমাস ট্রি ও দাড়িওয়ালা সান্টা ক্লজ দোকানে, হোটেলে, ঘরে ঘরে। শীতও পড়েছে জাঁকিয়ে। তবু কুঁকড়ে দমে যায়নি উৎসব-মুখর মানুষের মন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পেলাম পিয়ানোর শব্দ। ক্যারোলাইন পিয়ানো বাজাচ্ছে।

ইদানিং আমার ফ্ল্যাটের চাবি আমি ল্যাণ্ডলেডির কাছে রেখে বেরোতাম, ক্যারোলাইন তার সুবিধা মতো চলে আসতো, দরজা খুলে বই নিয়ে বসতো, নয় রান্না করতো, নয় তো পিয়ানো বাজাতো।

তার সঙ্গে আলাপের কিছুদিন পরে যখন জানলাম সে পিয়ানো বাজাতে পারে, পাড়ায় এক বাজনার দোকান থেকে একটা কটেজ পিয়ানো ভাড়া করে আনলাম। ঠিক হল তাকে বাংলা শেখানোর পরিবর্তে সে আমাকে পিয়ানো শেখাবে।

খুব ভাল বাজাতে পারতো সে। তার হাতে য়ুরোপের বিখ্যাত সুরকার বেটোফেন, বাখ, মোৎসার্ট, শুবার্ট, শর্প্যা প্রভৃতি সুরস্রষ্টাদের সোনাটাগুলি মূর্ত হয়ে উঠতো। প্রকৃত শিল্পী সে। আপনভাবে বিভোর হয়ে সে বাজাতো। তখন সব কিছু ভুলে যেতো সে।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সঙ্গী ডকটর এড্‌মণ্ড্‌ বাক-এর করা রবীন্দ্র সংগীতের কিছু পিয়ানো নোটেশানের একটা বই যোগাড় করে দিয়েছিলাম ক্যারোলাইনকে। সে মাঝে মাঝে সেই বই থেকে বাজাতো। আজও বাজাচ্ছিল একটি সুর।

আমি দরজা খুললাম সন্তর্পনে। আমার হাতে ছিল একটা প্যাকেট।

পিয়ানোর ওপর দেওয়ালে টাঙানো বড় আয়নার মধ্যে দিয়ে ক্যারোলাইন আমাকে দেখতে পেল। সে বাজনা বন্ধ করে টুলের ওপর ঘুরে বসল।

হাতের প্যাকেটটা পিছনে লুকিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু সেটি তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে বললে, "কি ওটা?"

"আমার সার্ট, লণ্ড্রী থেকে আনছি।"

"উঁহু! প্যাকেট দেখে তো মনে হল না লণ্ড্রীর। দেখি কি ওটা।"

"বললাম তো আমার কাচানো কাপড়।"

সে উঠে এল, মাথা হেলিয়ে প্যাকেট দেখে বললে, "এতো বাংলা খবরের কাগজের প্যাকেট। দেখি না।"

বললাম, "কাল দেখাবো।"

"না, এখুনি দেখবো। দাও দেখি।" সে ছেলে মানুষের মতো কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বললাম, "তুমি বাজাও। আমি আসছি ও ঘর থেকে।"

সে হঠাৎ ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল প্যাকেটটা। আমি তার হাত থেকে নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই সে অন্য হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরল।

এই প্রথম তার হাতের স্পর্শ পেলাম। এতদিন নিজেকে সতর্ক করে রেখেছিলাম। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি দিনের পর দিন। অনেক রাত অবধি সে আমার ঘরে কাটিয়েছে। আমি পড়াশুনো করেছি, সে রান্না করেছে, বাজনা বাজিয়েছে, বহু বিষয়ে গল্প আলোচনা করেছে। তাকে নিয়ে বেরিয়েছি সিনেমায়, থিয়েটারে, রেস্তোরাঁয়, বেড়াতে গেছি 'ক্যু' গার্ডেনে, টেমসের ধারে, হ্যাম্পস্টেড্ হীথ ও হাইড পার্কে—যে সব জায়গায় জোড়ে জোড়ে মেয়ে পুরুষ বসে থাকে জড়াজড়ি করে। প্রেমিক প্রেমিকাদের সেই ভীড়ে আমরা দুজন ঘুরে বেড়িয়েছি, বসেছি—আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো বন্ধন ছাড়াই। নিকটতম ঘনিষ্ঠতার পূর্ণমাত্রায় সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত ঘটলেও, ঐ সব মিলনাত্মক দৃশ্য দেখার প্রভাব আমাদের মনের ওপর পড়লেও, আমরা দু'জনেই সতর্ক থেকেছি, সংযত রেখেছি নিজেদের সকল ধরা-ছোঁওয়া থেকে।

ক্যারোলাইন হাত ছেড়ে দিল। আমিও আর প্যাকেট নিয়ে টানাটানি করলাম না।

সে সেটা খুলতেই তার মধ্যে থেকে বেরোল একটি নীল খদ্দরের শাড়ী ও ঐ রঙের ব্লাউজ।

অবাক হয়ে ক্যারোলাইন বাংলাতেই বললে, "কার জন্যে শাড়ী ব্লাউজ ?"

আজকাল ছোটখাটো বাক্য সে বাংলায় বেশ বলতে পারে।

ভারতীয় মেয়েদের শাড়ী ব্লাউজ দেখে তারও শখ হতো ঐ বেশ পরার। তাই দেশ থেকে আমার এক আত্মীয় আসছিল জেনে তাকে লিখেছিলাম একটা শাড়ী ও ব্লাউজ আনতে। সে আত্মীয় আজই লণ্ডনে এসে পৌঁচেছে, তার কাছ থেকে সেগুলি নিয়ে এসেছিলাম। ইচ্ছে ছিল ক্রীসমাসে ক্যারোলাইনকে দেবো ঐ উপহার।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বাংলাতেই বললে, "কার এগুলি ?"

আমি একটু হেসে বললাম, "এগুলি দেশ থেকে আনিয়েছি ক্যারোলাইন। তোমাকে আমার ক্রীসমাসের উপহার।"

ক্যারোলাইন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, সে যে অত্যন্ত অভিভূত সে কথা তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল।

বললাম, "পছন্দ হয়নি তোমার ?"

উত্তরে ক্যারোলাইন কিছু বলল না, শুধু শাড়ী ও ব্লাউজ তার গালের ওপর চেপে ধরল পরম সমাদরে !

পরদিন সন্ধে বেলায় আমার লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করছিলাম ক্যারোলাইনের জন্যে। ঘরখানি আজ রঙে বর্ণে বৈচিত্র্যে সাজে সজ্জায় অপরূপ দেখাচ্ছিল। মাথার ওপর সিলিং জুড়ে লাল নীল সবুজ হলুদ কাগজের ফুলের মালা দুলছে, মাঝে মাঝে বর্ণময় বেলুন, এক কোণে টুলের ওপর ছোট ক্রীসমাস ট্রি, তার সামনে তিনটে ষ্ট্যাণ্ডে মোমবাতি, দুটো জানালাতেও দুটো করে মোমবাতি, একপাশে টেবিলের ওপর রাখা আছে ক্রীসমাস কেক, প্লাম পুডিং, রোষ্ট টারকী।

ঘরের আলো জ্বালাইনি। মোমবাতিগুলিও না। অদূরের উঁচু বাড়ির মাথায় বিরাট নিয়ন সাইনের আলো জ্বলছে থেকে থেকে, তারই

রশ্মি ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ছে জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে ঘরের এক অংশে, রহস্যময় লাগছে সমগ্র পরিবেশ।

চার পাশের এই সাজ সজ্জা সব ক্যারোলাইন করেছে, নিজের টাকায় সব কিনেছে। খাবারগুলিও সেই বানিয়েছে সারাদিন ধরে আমার কিচেনে! ক্যারোলাইনের স্পর্শ এ ঘরের সর্বত্র।

বিকেলে সে গেছে তার মেসে পোষাক বদলের জন্যে।

জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই তার ভাবী স্বামীর দেশ থেকে ফেরার কথা। ক্যারোলাইন খবর পেয়েছে তার আপিস থেকে।

ইদানীং সে তার ভাবী স্বামীর চিঠি খুব কম পেয়েছে; গোড়ায় সে প্রতি সপ্তাহেই চিঠি পেতো! চিঠির সংখ্যা কমে যাওয়ায়, তার লণ্ডনে ফেরার সঠিক খবর না পাওয়ায় কিছুকাল থেকেই ক্যারোলাইন চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। থেকে থেকে সে গম্ভীর হয়ে যায়। কথা বলে না বেশি। আসে যায়, করণীয় কাজ বা পড়াশুনোয় ক্রুটি নেই, কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে ফুটে ওঠে তার মনের বিষণ্ণতা তার চোখে মুখে। মাত্র দুদিন আগে সে তার ভাবী স্বামীর আসার খবর পেয়েছে।

দরজা খোলার মৃদু শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। ক্যারোলাইন আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

তার পরনে আমার দেওয়া সেই নীল শাড়ী ও ব্লাউজ। ঘন লাল চুলের ছড়ানো গোছা এলিয়ে আছে কাঁধের ওপর, ফর্সা কপালে নীল রংএর টিপ, টানা দুটি চোখের নীচে সুর্মার রেখা, দু'হাতে কয়েক গাছা নীল কাঁচের চুড়ি। আঁটো সাঁটো শাড়ীর ঘেরে সুস্পষ্ট তার সুডোল নিতম্ব, ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে সুউচ্চ স্তনের প্রকাশ। সবুজ রঙের একটা জেড-এর হার তার বুকের খাজের মাঝখানে দুলছে!

অবাক হয়ে দেখছিলাম তাকে। কি অপরূপই না দেখাচ্ছিল তাকে ঐ সাজে!

আমাকে ঐ ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে বললে, "কি দেখছ

অমন করে? আমাকে কি তুমি চেন না, না আগে কখনো দেখনি? আমি ক্যারোলাইন কার্টার।"

বললাম, "আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, ক্যারোলাইন কার্টারকে এতদিন জানতাম, সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে নেই।"

ক্যারোলাইন একটু যেন লজ্জিত হয়ে হাসল। বললে, "শাড়ী ঠিক কি ভাবে পরতে হয় শিখতে গেছিলাম মিসেস ব্যানার্জির কাছে। তিনিই সাজিয়ে দিলেন আমাকে। এই চুড়ি, হার; টিপ সব তাঁরই। এই সাজে বাসে টিউবে এখানে আসতে লজ্জা করল, তাই একটা ট্যাক্সি করে এলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার তো আমাকে একজন ইণ্ডিয়ান লেডি বলেই ধরে নিল, সে কি বললে জানো? বললে, 'ই গুয়ান লাইডি' যে এত ফর্সা আর সুন্দর হয়, আগে তার জানা ছিল না। আমি তার ভুল ভাঙলাম না। আর তা ছাড়া, আমি তো আর কিছুদিনের মধ্যে সত্যিই একজন ইণ্ডিয়ান লেডি হবো। তাই না?"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে ক্যারোলাইন থামল। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বললে, "কথা বলছ না যে!"

"কি বলবো, বল!"

"বাঃ, তাও কি বলে দিতে হবে?"

আমি তবু চুপ করে তাকে অভিভূতের মতো দেখতে লাগলাম। সে বললে, "ঘরের আলো, মোমবাতি কিছুই না জ্বালিয়ে এমন করে অন্ধকারে বসে আছ যে!"

বললাম, "বাইরে আলো জ্বলছে না, কিন্তু মনের ভিতরে তো আলো জ্বলছে ক্যারোলাইন! আর সে আলো তুমিই জ্বালিয়ে দিয়েছ!"

সে আমার কথায় চুপ করে দেখল আমাকে। তারপর বললে, "মনের মধ্যে আলো কি কোনো মানুষ জ্বালিয়ে দিতে পারে! এ আলো ভগবানের। শুনতে পাচ্ছ না গীর্জায় ঘণ্টা বেজে চলেছে!"

সে জানালার সামনে গিয়ে বাড়ীর কাছের গীর্জার চূড়োর দিকে তাকিয়ে রইল।

গীর্জার ঘণ্টা অনেকক্ষণ ধরেই শুনছিলাম।

অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হল, ডাকলাম, "ক্যারোল।"

"উঁ!" সে জানালার কাছ থেকে সরে আমার চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়াল। সুন্দর সেন্টের মৃদু গন্ধ আমার দেহে মনে যেন সঞ্চারিত হল। পাউডারের গন্ধে বাতাস যেন নেচে উঠল!

আমি কিছু বলতে পারলাম না। সব শব্দ যেন হারিয়ে গেল বুকের মধ্যে যেখানে বাজছিল তখন আসন্ন বিদায়ের সুর। তার দেওয়া উপহার দামী টাইটা আঙুলে জড়াতে লাগলাম শুধু। ক্যারোলাইন আমাকে নীরব দেখে ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা দেশলাই তুলে নিয়ে মোমবাতিগুলি ধরাতে লাগল।

যেদিন ক্যারোলাইনের ভাবী স্বামীর লণ্ডনে ফেরার কথা, সেই দিন আমি রওনা হয়ে গেলাম প্যারিসে সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই।

ক্যারোলাইনের কথা সর্বক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরছিল। এই তিন মাসের এক সঙ্গে কাটানো বহুদিন ও রাত্রির সুখস্মৃতি মনের অতলে আসন্ন নিঃসঙ্গতার বেদনায় ভরে দিয়েছিল। জীবন মনে হচ্ছিল বড় এক ঘেয়ে বিরক্তিকর, আর অনেক দীর্ঘ। মনে হচ্ছিল আমি এক সুখের স্বপ্ন দেখছিলাম যা শেষ হয়েছে এক বিভীষিকায়!

প্যারিসে গিয়ে 'আইফেল টাওয়ারে'র আকাশচুম্বী গরিমা, 'সাঁজে, লিজে'র মোহিনী মায়া, 'সেন' নদীর রোমাঞ্চকর পরিবেশ, কিম্বা আলোয় ঝলমলে প্রলুব্ধ যৌবনের হাতছানি ভরা মোমার্ত্, আমাকে একটুও আনন্দ দিতে পারল না। সেখানেও ক্যারোলাইনের মুখ আমাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করে ফিরল। তার স্মৃতি আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। কেবলই মনে পড়ল লণ্ডনে আমার ফ্ল্যাটে তার শেষ বিদায়ের দিনের কথা। সেদিনো তার পরনে শাড়ী ব্লাউজ, তবে আর

কোনো সাজ ছিল না। অনেক রাত অবধি সে ফ্ল্যাটে কাটাল। প্রথম দিকে কিছুটা সময় কাটল পিয়ানো বাজানোয়, হাসি ও গল্পে, তখনো আমি জানতাম না সে তার শেষ রাত, সে এসেছিল বিদায় নিতে! শেষে এক সময়ে সেই চুপ করে গেল। নীরবে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার হঠাৎ ভাবান্তর দেখে আমিও চুপ করে গেলাম, বিস্মিত হলাম। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে পোকার দিয়ে জ্বলন্ত কয়লাগুলিকে ভিতরে ঠেলতে লাগলাম।

এক সময়ে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার গভীর নীল চোখ দুটি আমার ওপর স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো, মুখ থমথম করতে লাগল। ফায়ারপ্লেসের গমগমে আগুনের আলোয় তার সুন্দর মুখ উদ্ভাষিত। সে আমার হাতে একটা হাত রাখল, কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল গভীর স্তব্ধতায়। সমস্ত ঘরখানা যেন এক অজানা রহস্যে গেল ভরে। তারপর ক্যারোলাইন তার হাতখানি ছেড়ে আমার দিকে চেয়ে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, "এবার আমি যাবো।" এত মৃদু তার কণ্ঠস্বর যে আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম না তার সামনে দাঁড়িয়েও। সে একটু থেমে আবার বললে, "এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে তুমি আমার জন্যে যা কিছু করেছ এই তিন মাস—তা আমি জীবনে কোনো দিন ভুলবো না।"

আর কিছু সে বলতে পারল না, গলা কেঁপে গেল তার। দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার গালের ওপর।

আমি তিন সপ্তাহ পরে প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরে এলাম।

এসেই আমার চিঠির বাক্স খুলে দেখলাম। কয়েকটি চিঠি ছিল। ক্যারোলাইনের চিঠি বা তার বিয়ের নিমন্ত্রণের কার্ড পাবার প্রত্যাশা ছিল, কোনো কিছু ছিল না তার।

আমি তার মেস ও আপিসের ঠিকানার ফোন নম্বর জানতাম! কিন্তু তার খোঁজ করলাম না। প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল, বুকের

মধ্যে বেদনা। সে তার ভাবী বা বর্তমান স্বামীকে নিয়ে সুখে থাক —এই কামনাই করলাম।

কয়েকদিন পরে ছিল আমার জন্মদিন। সেদিন সকালের ডাকেই পেলাম তার চিঠি। নটিংহামের ডাকঘরের ছাপ মারা।

আমার জন্মদিনে সে তার শুভ কামনা জানিয়েছে। আরো জানিয়েছে সে ও তার স্বামী বর্তমানে নটিংহামেই বাস করছে। সে সেখানে এক স্কুলে শিক্ষিকার কাজ পেয়েছে। লিখেছে ভবিষ্যতে যদি কখনো নটিংহামে যাই, তাহলে যেন মিসেস বারওয়েলের ঠিকানায় তার খোঁজ করি। ঠিকানা সে দিয়ে দিয়েছিল।

নটিংহামে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলেও অনেকদিন পর্যন্ত যাওয়া হয়ে উঠল না! কেটে গেল কয়েক মাস।

শেষে একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম সেখানে যাবার।

সেখানে পৌঁছে ঠিকানা খুঁজে বার করলাম। ঘণ্টা বাজাতে দরজা খুললেন এক প্রৌঢ় মহিলা। আমি সুপ্রভাত জানিয়ে নাম বললাম।

"আসুন মিঃ সেন।" তিনি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তাঁকে অনুসরণ করে মাঝারি এক লাউঞ্জে প্রবেশ করলাম, সুসজ্জিত, রুচিশীল! ম্যান্টলপিসের ওপর একটা ষ্ট্যাণ্ডে দু'জনের আবদ্ধ ছবি। ক্যারোলাইনের পরনে বিয়ের গাউন ও মাথায় ওড়না, পাশেরটি যে তার স্বামী বুঝতে পারলাম। ক্যারোলাইনের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

"আপনি বসুন মিঃ সেন। ক্যারোলাইন তার স্বামীকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে, এখুনি ফিরবে।"

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, "হাসপাতালে কেন? বিপদ জনক কিছু ঘটেছে কি?"

"না, এটা ঐ নিয়মমাফিক দেখিয়ে আসা।"

মিসেস বারওয়েলের কথা ঠিক বুঝলাম না। তবে কি ক্যারোলাইন
র্ভবতী, তাই ডাক্তার দেখাতে গেছে! কিন্তু এ প্রশ্ন আমি তার
সীকে করতে পারলাম না।

সোফায় বসে সেই ফটোর দিকে তাকিয়ে বললাম, “ক্যারোলাইনের
ামী বেশ সুপুরুষ।”

মিসেস বারওয়েল বললেন, “ঐ সৌন্দর্যে কি লাভ যা অকেজো,
ঙ্গু!”

আমি সোজা হয়ে বসলাম, বললাম, “আমি আপনার কথা ঠিক
ঝতে পারলাম না মিসেস বারওয়েল।”

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, “তাহলে সে আপনাকে
কছুই বলেনি! ছেলেবেলা থেকেই ও ঐরকম! চিরকাল আত্মকেন্দ্রিক,
নিজের দুঃখ কষ্ট বেদনা নিজের মনের মধ্যেই রাখতে ভালবাসে।
াউকে বলে না। আশ্চর্য! যখন ও আপনার কাছে বাংলা পড়ার
ন্যে যাওয়া আসা করতো, তখনই তো তার স্বামীর দুর্ঘটনা ঘটে
ভারতবর্ষে। সেখানে ট্রেণে ভ্রমণ করার সময় একদিন হঠাৎ তার
্বামীর পা কাটা যায় প্ল্যাটফরম থেকে পড়ে ট্রেণের চাকার তলায়।
ুটো পাই বাদ দিতে হয়।”

মিসেস বারওয়েল থামলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে
তাকিয়ে ছিলাম।

তিনি বললেন, “এ ব্যাপারটা তো ক্রীসমাসের অনেক আগেই
ঘটেছে, অথচ ক্যারোল আপনাকে কিছু বলেনি, সে তো সবই
জানতো!”

আমি কি স্বপ্ন দেখছি! না ভুল শুনছি!

মিসেস বারওয়েল বললেন, ‘ওর স্বামী দেশ থেকে লিখেছিল এ
বিয়ে ভেঙে দিতে, সম্পর্ক ছিন্ন করতে, তাকে ভুলে যেতে কারণ সে
এখন বিকলাঙ্গ, পঙ্গু, সংসারে কোনো কাজেই সে লাগবে না। তাকে
ক্যারোলাইনের বিয়ে করার কথাই আর ওঠে না। কিন্তু ক্যারোল

শুনল না। বেচারা দেশ থেকে ঐ অবস্থাতেই এ দেশে আসলো তাকে বোঝাতে, কিন্তু ক্যারোল অটল, অবিচল রইল। সে এ বিয়ে ভাঙবে না। আমি ও তার অন্য আত্মীয়রা কত বোঝালাম তাকে, কারো কথা সে গ্রাহ্য করল না, বললে, 'বিয়ের পরে যদি এই দুর্ঘটনা ঘটতো তাহলে আমি কি পারতাম তাকে ডিভোর্স করতে!'

আমি আবার সেই ফটোর দিকে তাকালাম। ঐ অনন্যসুন্দর মুখেরই সে শুধু অধিকারিনী নয়, এক অসাধারণ মানসিক সম্পদেরও অধিকারিনী সে! তার ঐ সৌন্দর্যের মধ্যে, এত শক্তি লুকিয়ে ছিল। কখনো বুঝিনি আগে! ঐ হাসির আড়ালে কি এক মর্মান্তিক বেদনা লুকিয়ে নেই, না কি সে এতেই পেয়েছে তার মনের আনন্দ, সব পার্থিব সুখ সম্ভোগ বিসর্জন দিয়ে!

ক্যারোলাইনের সঙ্গে দেখা করার সাহস হল না। তার সামনে আর দাঁড়াতে পারবো না কিছুতেই। বুকের মধ্যে ব্যথা বাড়ছিল, বুঝতে পারছিলাম আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারবো না, তাই আমি উঠে পড়লাম! বললাম, "আমি দুঃখিত মিসেস বারওয়েল, আমাকে এবার যেতে হবে।"

"সে কি! এই এলেন, আর ক্যারোলের সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবেন!"

"আমায় এখুনি লণ্ডনে ফেরার ট্রেণ ধরতে হবে। আমি এখন চলি।

মিসেস বারওয়েল বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন বললেন, "ক্যারোলের সঙ্গে দেখা না করে গেলে ও যে বড় দুঃখ পাবে মিঃ সেন!"

আমি একটু হাসার চেষ্টা করলাম, "আবার এক সময়ে আসবো মিসেস বারওয়েল। ওকে আমার অশেষ শুভেচ্ছা জানাবেন।"

আমি দরজার দিকে এগোলাম। মিসেস বারওয়েল পিছনে আসলেন। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম করমর্দনের জন্যে, বললাম "বিদায় মিসেস বারওয়েল!"

বোধহয় তিনি আমাকে অভিভূত হতে দেখে থাকবেন। কিছু বলতে গিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন, তারপর আমার হাতখানি পরম সমবেদনায় টেনে নিয়ে চেপে ধরলেন।

আমি বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হতেই দেখলাম একটা ট্যাক্সি এসে সেই বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। ক্যারোলাইন নামল, তার ব্যাগ খুলে ড্রাইভারকে ভাড়া দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে অতি সন্তর্পনে তার স্বামীর হাত ধরে তাকে ট্যাক্সি থেকে নামাল, তার বগলে ক্রাচ দু'টো দিতে সে তার ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্যারোলাইন তার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ধীরে ধীরে বাড়ীর দরজার দিকে এগোল।

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। যদি হঠাৎ ক্যারোলাইন মুখ ফিরিয়ে রাস্তার অপর ফুটপাতের দিকে তাকায়, তাহলে সে আমাকে দেখতে পাবে!

আমি দ্রুত পায়ে ট্যাক্সি ধরবার জন্যে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম।

অড্রি ব্রাউন

আমার ফ্ল্যাটের রুম মেট ও দেশের বন্ধু সুজিতের বুকের পাঁজরা ভেঙেছে। কদিন থেকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে প্রবল জ্বর।

তখন আমার কলেজ ও পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ততা, তারই মধ্যে রান্না, গৃহস্থালীর কাজ। এর ওপর বন্ধুর সেবা, ডাক্তার ওষুধ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

ন্যাশনাল হেল্‌থ্‌ স্কীম-এ যে প্রৌঢ় বাঙালি ডাক্তারের প্যানেলে আমাদের নাম ছিল, তিনি আমাকে বললেন, "ওকে হাসপাতালে দাও, সার্জিকাল কেস! ঘরে রেখে চিকিৎসা হবে না।"

আমাকে স্নেহ করতেন তিনি, বললেন, "তাছাড়া তোমার পরীক্ষা সামনে। এ সব নিয়ে সময় কাটালে পড়বে কখন?"

কিন্তু বন্ধুটি হাসপাতালের নামে বেঁকে বসল। কিছুতেই যাবে না, বললে মরতে হয় ঘরেই মরবো। আমার অনেক আত্মীয় হাসপাতালে মরেছে, অতএব হাসপাতালং অহং ন গচ্ছামি।

তাকে বোঝালাম যে তার যে আত্মীয়রা হাসপাতালে মারা গেছে, সে হাসপাতালগুলি অবশ্যই জব চার্ণকের শহর কলকাতায় অবস্থিত। এখানে নয়। এখানকার হাসপাতালগুলিতে মানুষ মেরে ডাক্তারি শেখার পদ্ধতি এখনো চালু হয়নি। তোমার ভয় নেই।

কিন্তু সুজিতের ঐ এক কথা, হাসপাতাল, তা সে কলকাতা লণ্ডন কারমাটার বা কামাস্কাট্‌কা যেখানেই হোক—সব একমেবা-দ্বিতীয়ম!

কী আর করা!

ঘরেই থাকল সে, কিন্তু যন্ত্রণার উপশম নেই। হবে কি করে! ট্যাবলেট খাইয়ে সাময়িক যন্ত্রণা বন্ধ হতে পারে, কিন্তু সার্জিকাল

কেসে অন্য কিছু চিকিৎসা চাই—কতটা ভেঙেছে, কোথায় ভেঙেছে তার ছবি তোলা চাই। সে সব ঘরে বসে হবে নাকি!

আমাকে নির্বিকার দেখে সুজিত নিজেই যন্ত্রণায় কোঁকাতে কোঁকাতে বাড়ি থেকে ডাক্তারকে ফোন করল, "বুকে বড় ব্যথা। কিছু ওষুধ দিন।"

ডাক্তার বললেন, "শেখরের খবর কি? ওর পড়াশুনা কি রকম হচ্ছে? বেচারার বড় ক্ষতি হচ্ছে সময়ের! ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো, প্রেসক্রিপসান লিখে দেবো।"

ধুত্তোর শেখরের নিকুচি করেছে! আমি মরছি যন্ত্রণায়, উনি খালি শেখর শেখর করে মরচেন! বলে সুজিত ফোন রেখে দিল। আমাকে অভিসম্পাত দিতে গিয়ে তার বুকের ব্যথা গেল আরো বেড়ে।

সাতদিনের দিন অবস্থা আরো কঠিন হল, এবং তখন আমার ও অন্য বন্ধুদের পরামর্শ মানতে হল সুজিতকে।

লণ্ডনে আমি তার সবচেয়ে নিকট বন্ধু। সবাই ব্যস্ত যে যার কর্মে। তাই আমিই নিয়ে গেলাম তাকে চেয়ারিংক্রশ হাসপাতালে পরদিন সকালে। আউটডোরে নামমাত্র পরীক্ষা করেই তাকে ইনডোরে ভর্তি করা হল। দশ মিনিটেরও কম সময় লাগল।

আমি তার স্থানীয় অভিভাবকরূপে সই করলাম কাগজ পত্রে।

সুজিত বললে, "এখানে যদি মরি তাহলে ভূত হয়ে তোর ঘাড়ে চাপবো!"

হেসে বললাম, "দেশ থেকে ভূত তাড়ানোর মন্ত্র শিখে এসেছি। আমার ভয় নেই!"

তাকে চাকার গাড়িতে শুইয়ে নিয়ে গেল ভিতরে। বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে আসবো বলে বেরিয়ে গেলাম হাসপাতাল থেকে।

বিকেলে হাসপাতালে মেল সার্জিকাল ওয়ার্ডে তার বেড এ গিয়ে

দেখি সার্জেন তার বুকের একস্‌রে প্লেটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নর্স পাশে।

এ সময়ে সার্জেন আসেন না ওয়ার্ডে, কিন্তু সুজিতের ব্যথা খুব বেড়ে যাওয়ায় নর্সের কাছে খবর পেয়ে চলে এসেছেন দেখতে। এখন তাঁর ছুটির সময়।

সার্জেনকে দেখে সম্ভ্রম জাগল। ছ' ফুট লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্যবান। চোখে চশমা, সুদর্শন, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর রাশভারি মনে হল।

আমাকে দেখে বললেন, "বন্ধু ? না আত্মীয় আপনি ?"

বললাম, "দুই-ই।"

"ওঁর চারটে রিব ভেঙেছে।" তারপর সুজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পড়ে গেছিলেন ? কিন্তু পড়লে তো এ ভাবে ভাঙে না! ভারি আশ্চর্য !"

সুজিত কুঁকিয়ে কি বললে, বোঝা গেল না।

আমি বললাম, "ওর এক বান্ধবী আছে, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ওর দ্বিগুন। তার দৃঢ় আলিঙ্গনে বোধহয় রিবগুলো—"

আর বলতে হল না। রাশভারি সার্জেনের ঠোঁটের কোণে হাসির মৃদু রেখা ফুটে উঠল। নর্সটি হেসে মুখ পিছন দিকে ফেরাল আর সুজিত আবার কুঁকিয়ে উঠল।

সার্জেন নর্সকে কি সব নির্দেশ দিলেন। আমি পাছে আবার কিছু বলে বসি আর নর্সের সামনে তাঁর অটল গাম্ভীর্য নষ্ট হয় সেজন্যে আমার দিকে নড্‌ করেই চলে গেলেন। নর্স তাঁর অনুসরণ করল।

সুজিত বললে, 'আমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি আর তুই ঠাট্টা মসকরা করছিস ? লজ্জা করে না তোর ?"

বললাম, "লজ্জা তো নেই ! কতবার বলেছি ঐ জলজ্যান্ত আড়াইমনি লাশ নিয়ে ঘুরিস না! ফস্টি নস্টি করিস না! শুনলি না তো আমার কথা, দিল তো চারটে চারটে রিব ভেঙে! এই বয়সে আর কি 'রিব' মেরামত হবে ?"

সুজিত এত রেগে গেল যে আর কথা বলল না।

"ঐ নর্সটি গেল কোথায় ?"

সুজিত বললে, "অমনি নজর পড়েছে ?"

"অমন সুশ্রী যুবতী, নজর পড়বে না! ও যদি নর্সিং করে, আমিও কাল হাত পা ভেঙে এখানে এসে শুয়ে থাকতে রাজী আছি।"

"অড্রি ব্রাউন সে রকম মেয়ে নয়। খুব সোবার, তোর ফাজলামো ওর কাছে চলবে না!"

"ওর নাম বুঝি অড্রি ব্রাউন ? এর মধ্যে নামও জেনে ফেলেছিস ?"

সুজিত কিছু বলার আগেই অড্রি এসে দাঁড়াল। একটা ট্যাবলেট সুজিতের মুখে পুরে দিল, জল ঢেলে দিল মুখের মধ্যে।

আমি অড্রিকে বললাম, "এই ওয়ার্ডে তোমার ওপরে কটা বেড-এর ভার আছে মিস ব্রাউন ?"

অড্রি একটু বিস্মিত হয়ে বললে, "ছ'টা। কেন ?"

"একটা বেড খালি আছে কি ?"

"না।"

"না থাকাই স্বাভাবিক। তোমার মতো নর্স থাকলে রোগীদের রোগ সহজে সারবে না! বেড খালি থাকার সম্ভাবনা কম!"

হেসে ফেলল অড্রি।

সুজিত কুঁকিয়ে উঠল।

"কি হল ?"

"ব্যথা!"

অড্রি সুজিতের বুকে হাত বুলিয়ে দিল।

বললাম, "হাত বুলিয়ে দিলে ওর ব্যথা বাড়বে বই কমবে না মিস ব্রাউন! ঐ ট্যাবলেট যা দিয়েছ তাতেই কমবে। বেশি হাত বুলোলে ওর কোনো রিব কোনোদিন জোড়া লাগবে না। সার্জিকাল কেস সাইকোলজিকাল কেস হয়ে দাঁড়াবে! শেষে চেয়ারিংক্রশ হাসপাতাল থেকে মোজলে হাসপাতালে চালান দিতে হবে!"

অদ্রি হাসল। ওর গালে টোল পড়ল হাসতে গিয়ে। অপূর্ব হাসিটি!

সুজিত কটমট করে তাকাল আমার দিকে।

অদ্রি চলে গেল।

বললাম, "তোর সেই রিব-ভাঙা বান্ধবী হাইডি এল না তোকে দেখতে?"

সুজিত চুপ করে থাকল। আমার ওপর রীতিমতো চটেছে!

বলতে না বলতে হাইডি এসে হাজির। হাতের প্যাকেটে আপেল।

"ডার্লিং, কেমন আছ? কি হল বল তো?"

হাইডি অবশ্য সুজিতের চেয়ে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দ্বিগুন নয়, তবে বেশ বলশালিনী বলা চলে। উচ্চতায় সুজিতের চেয়ে লম্বাই।
তার মুখে একটা শ্রী আছে, লাল চুল, ঢেউ খেলানো দেহ, তবে সবটাই মাত্রাধিক। তাই তাকে দেখলে আমাদের মতো ক্ষীণ দেহসর্বস্ব বঙ্গ সন্তানদের রোমাঞ্চ জাগার কথা নয়, পাঞ্জাব আফগানিস্থানের বাসীন্দারা হলে জোড় ভালোই মানাতো!

হাইডি পাশের টুলে বসে সুজিতের মাথায় হাত বুলোতে লাগল, নিম্নকণ্ঠে বোধ হয় প্রেমালাপ শুরু হল তাদের।

আমি তাদের একা থাকতে দিয়ে ওয়ার্ডের চারিদিকে তাকিয়ে অদ্রির সন্ধান করতে লাগলাম। দেখি সে ওয়ার্ড-মেট্রনের কাছে বসে আছে। এ সময়টা রোগীদের আত্মীয় স্বজনদের আসার সময়, তাই ডাক্তার নার্সদের কর্মবিরতি, প্রয়োজনে তাদের মুহূর্তের মধ্যে পাওয়া যায়!

আমি ওয়ার্ডের বাইরে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেখা করার সময় শেষ হতেই ঘণ্টা পড়ল, আমি ফিরে গেলাম সুজিতের কাছে।

হাইড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিল, সুজিতের হাতে হাত রেখে বললে, "বাই ডার্লিং, কাল আবার আসবো।"

আমিও বিদায় নিলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে হাইডিও বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে।

হাইডি বললে "তোমার এখন কি প্রোগ্রাম?"

বললাম, "আমার ইভনিং ক্লাস শুরু হতে দেড় ঘণ্টা সময় আছে, ভাবছি একটা নিউজ সিনেমায় ঢুকে পড়বো এই সময়টুকুর জন্যে। কোথায় আর ঘুরবো এখন!"

"নিউজ সিনেমা!" হাইডি বললে, "তোমার আপত্তি না থাকলে আমিও যেতে পারি তোমার সঙ্গে। আমারও এখন কোনো কাজ নেই!"

সামান্য অবাক হলেও বললাম, "বেশ তো, চল।"

এক সিলিং এর তু'খানা টিকিট কিনে ঢুকলাম। পাশাপাশি বসলাম তু'জনে। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর দেখি হাইডি আমার হাতের ওপরে হাত রেখেছে। হয়তো খেয়াল নেই, হতে পারে। সুজিতের বান্ধবী, আমি আলতো করে হাত সরিয়ে নিলাম, খানিকক্ষণ পরে দেখি তার হাতটা আবার আমার হাতে পড়ল।

ব্যাপার সুবিধার নয়!

বেচারী সুজিত! হাসপাতালে শুয়ে কোঁকাচ্ছে যন্ত্রণায়, এদিকে—!

পরদিন হাসপাতালে সুজিতকে দেখতে গিয়ে হাইডির দেখা পেলাম না। সে আসেনি সুজিতকে দেখতে। পরপর কয়েকদিনই আর তাকে দেখা গেল না। অসুস্থ রিব-ভাঙা বয়-ফ্রেণ্ডের প্রতি তার আকর্ষণ আর থাকেনি। সুজিত সেরে যাবার পরেও আর তাকে দেখিনি কখনো।

কিন্তু এ কাহিনী হাইডির নয়, এটি অড্রির। তার কথাই বলি।

কদিন ধরে যাতায়াত করে অড্রির সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেছিল। অবশ্য সেখানে কর্তব্যরত নর্স সে, রোগী বা বাহিরাগতদের সঙ্গে

গল্প করা রীতিবিরুদ্ধ, দৃষ্টিকটুও। ওপরওয়ালার নজরে পড়লে তার দুর্নাম রটবে, তার সার্ভিস রেকর্ড খারাপ হবে। তাই তার কাজের ফাঁকে আসা যাওয়ার মধ্যে সামান্য দুচারটে কথা ছাড়া আর কোনো কথাই হতো না। তার সুমিষ্ট চেহারা, যৌবন, ব্যবহার সব কিছুই আকর্ষণীয়, সুজিতকে দেখতে যেতাম বটে, কিন্তু অদ্রিকে দেখার জন্যে যে প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখতাম ভিজিটিং আওয়ারের অপেক্ষায়; সে কথা অস্বীকার করবো না। কথা হোক বা না হোক, তাকে একবার চোখে দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারতাম না।

সেদিন ট্রাফ্‌ল্‌গার স্কোয়ারের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গে দেখা। আমি হাসপাতালের দিকেই যাচ্ছিলাম। তাকে নর্সের পোষাকে হাসপাতালের মধ্যেই দেখেছি—বাইরে সাধারণ পোষাকে এই প্রথম।

তখন গ্রীষ্মকাল।

সাদা ফুল-স্লীভ ব্লাউজ ও নীল রঙের স্কার্ট পরা। হর্সটেল করা চুল পিছনে বাঁধা। সাজগোজে বাহুল্য নেই, কিন্তু সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে।

আমি অবাক হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম, বললাম, "মিস ব্রাউন! তুমি এ সময়ে বাইরে? আজ কি তোমার ছুটি?"

সে একটু হেসে বললে, "আজ আমার ছুটির দিন।" তারপর বললে, "তুমি হাসপাতালে যাচ্ছ?"

হাসপাতালে যাবার থাকলেও এখন আর ইচ্ছে করছিল না। সেখানকার আকর্ষণ কমে গেছিল, সুজিত এখন ভালোর দিকে, তাই ভাবলাম, আজ আর যাবো না। অদ্রির সঙ্গে আলাপের সুযোগ যখন পেলাম তখন সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো।

বললাম, "সকালে হাসপাতালে ফোন করেছিলাম, শুনেছি সে ভালোই

আছে। তাই আজ না গেলেও চলে। তোমার সঙ্গে বরং কথা বলা যাক। আশা করি তোমার সময় হবে?"

অদ্রি একটু চুপ করে থেকে বললে, "কিন্তু তোমার বন্ধু তোমার পথ চেয়ে আছে। তার কাছে না যাওয়া কি ঠিক হবে! ওর বড় একা লাগবে।"

লজ্জা পেলাম ওর কথায়। বললাম, "বেশ, আমি যাচ্ছি, কিন্তু কথা দাও তুমি ছ'টার পর আমার সঙ্গে দেখা করবে কোথাও? অবশ্য তোমার কোনো কাজ থাকলে অন্য কথা।"

অদ্রি বললে, "কয়েকটা জিনিস কিনতে এসেছিলাম পিকাডিলিতে, সেগুলি কিনে বাড়ি ফেরার কথা। আমি দু ঘণ্টা পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো পিকাডিলি টিউব স্টেশনে নীচের টিকিট কাউণ্টারের কাছে। ঠিক আছে?"

খুশী হয়ে বললাম, "ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।"

ঠিক ছটার সময়ে আমাদের দেখা হল পিকাডিলি টিউব স্টেশনের নির্দিষ্ট স্থানে। তার হাতে দুটো প্যাকেট। বললাম, "চল, ওপরে উঠে কোনো রেস্তোরাঁয় বসা যাক।"

ওপরে উঠে সে বললে, "আমি সাতটার সময়ে চলে যাবো, সেজন্যে বড় কোনো জায়গায় না গিয়ে ছোটখাটো কোথাও চল।"

'লায়ন্স কর্ণার হাউসে' ঢুকলাম তাকে নিয়ে। তখনো সেখানে ডিনারের জন্যে ভিড় হয়নি তেমন, জায়গা পেয়ে গেলাম।

বসার পর বললাম, "ডিনার খাবে তো?"

"না, শুধু চা।"

বুঝলাম সে আমাকে বেশি খরচ করতে দিতে চায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় থাকো তুমি?"

"টুইকেনহাম, মিড্‌ল সেকস্‌-এ। ওখানকার সাউথ-মিড্‌ল্ সেক্স

হাসপাতালে আমার নর্সিং-এর প্রথম চাকরী, ওখান থেকে চেয়ারিং-ক্রশে এই মাসেই বদ্‌লি হয়ে এসেছি।”

জিজ্ঞেস করল, “তোমার বন্ধুকে কেমন দেখলে ?”

“ভালোই আছে। কবে ছাড়বে ওকে ?”

“সার্জেন ওকে আগামী সপ্তাহে ছেড়ে দেবেন।”

চা ও স্ন্যাকস খেতে খেতে আলাপ জমে উঠল আমাদের।

অড্রি তার মাকে নিয়ে টুইকেনহামে থাকে, তার দাদা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করছে, সেখানেই বিয়ে করে সংসারি হয়েছে। মা বৃদ্ধা, বাতে পঙ্গু। অড্রিই তাঁর আশা ভরসা।

কথা বলতে বলতে সময় হয়ে গেল। অড্রিকে অনেক দূর যেতে হবে, উঠে পড়লাম, তারপর তাকে পিকাডিলি টিউব স্টেশনে ছেড়ে দিলাম। যাবার আগে তার ঠিকানা লিখে নিলাম, আমার ঠিকানাও সে লিখে নিল তার ডায়েরিতে।

পরদিন তার সঙ্গে দেখা হল হাসপাতালেই সুজিতকে দেখতে গিয়ে। বিশেষ কোনো কথা হল না। এমন কি আগের দিন যে আমাদের দেখা হয়েছিল, সুজিতকে সে বলেনি দেখে আমিও বললাম না।

সুজিত ক্রমশ ভালো হয়ে উঠছে দেখে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সার্জেন তাকে ছেড়ে দিলেন। সেদিন বিকেলে গিয়ে শুনলাম পরদিন তাকে নিয়ে যেতে পারি। অড্রি সার্জেনের নির্দেশগুলি লিখিত একটা কাগজ আমাকে দিল, ধন্যবাদজ্ঞাপন ও সৌজন্যমূলক কথা ছাড়া আর কোনো কথা হল না তার সঙ্গে।

সুজিতকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর হাসপাতালে যাবার আর কোনো সুযোগ থাকল না, অড্রির সঙ্গে দেখাও হল না।

এর পর আমার পরীক্ষার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পড়ার চাপে অড্রির কথা প্রায় ভুলে গেলাম।

দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে গেল।

সুজিত দেশে ফিরে গেছে। লণ্ডনে আমার কোর্স শেষ হয়ে গেছিল। আমি পশ্চিম জর্মনীতে কিছুকাল থাকার জন্যে তোড়জোড় করছি।

হঠাৎ একদিন অপরিচিত কাঁপা কাঁপা মেয়েলি হাতের ঠিকানা লেখা চিঠি পেলাম। লিখেছেন অড্রির মা মিসেস আগাথা ব্রাউন। বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে তাঁর টুইকেনহামের বাড়িতে একবার সময় করে যেতে অনুরোধ করেছেন। দয়া করে আমি যদি যাই তিনি তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

অবাক হলাম। অড্রির কথা এই এক বছরে বড় একটা মনে ছিল না। কোনো হাসপাতালের পাশ দিয়ে গেলে অবশ্য পুরোনো স্মৃতি হিসাবে সুজিতের অসুস্থতা ও অড্রির কথা মনে পড়তো। মনে হতো তার সঙ্গে দেখা হলে ভালো লাগতো! চেহারাটা তার মিষ্টি, ব্যবহারও তেমনই। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তার শিশুর মতো সারল্য। মনে হতো বড় নিষ্পাপ মন ওর! হাসপাতালে যাতায়াতের সময়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছি, ওকে দেখেছি অন্য রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে, সেবা করতে। সব বিষয়ে একনিষ্ঠ।

তাতে ওর সম্বন্ধে এইটেই মনে হয়েছে যে ওকে নিয়ে আর যাই হোক, খেলা করা চলে না।

ওর মতো মেয়ের পুরুষ-বন্ধু থাকা খুবই স্বাভাবিক, হয়তো তার আছে অড্রি বাগ্‌দত্তাও!

অড্রির মার চিঠি পেয়ে ভেবে পেলাম না অড্রি চিঠি না লিখে তার মা লিখলেন কেন! অড্রি নিশ্চয়ই আমার ঠিকানা তাঁকে দিয়েছে, তাহলে সে নিজে লিখলো না কেন!

চারদিন পরে রবিবার। সেদিন সকালেই টুইকেনহামে গেলাম। খুঁজে বার করলাম মিসেস ব্রাউনের বাড়ি।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক প্রৌঢ়া দরজা খুললেন। বলা বাহুল্য, তিনিই মিসেস ব্রাউন, অদ্রির মা। বাতে পঙ্গু বোঝা যায় হাঁটা দেখে।

আমার পরিচয় দেবার আগেই তিনি বললেন, "মিঃ সেন ?"

"হ্যাঁ, আমিই। সুপ্রভাত মিসেস ব্রাউন। আপনার চিঠি পেয়ে—"

"দয়া করে ভিতরে আসুন।"

সামনের ঘরটা সিটিং-কাম-বেডরুম। আসবাব পত্র বিশেষ কিছু নেই সামনের দিকে, একটা সোফা ও সেণ্টার টেবিল, দেওয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল চেয়ার ও ওয়ার্ডরোব। একপাশে দরজা, কিচেন দেখা যাচ্ছে। অন্য দিকে একটা কাঠের পার্টিসান।

"আসুন।"

তাঁকে অনুসরণ করে পার্টিসানের ওদিকে গেলাম। একটা খাট, ডিভান ও টেবিল। খাটে শুয়ে আছে যে তার মুখটা দেখে চিনতে পারলাম—সে অদ্রি।

সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসি খুশী প্রাণবন্ত যুবতী—এর এ কি অবস্থা! সারা মুখে কালির প্রলেপ, চোখের কোল বসা, কাজলের মতো কালো গভীর দুটো রিং দু'চোখের নীচে। শীর্ণ দেহ কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে, তার শরীরের ওপরে সাদা চাদর ঢাকা থাকলেও বুঝতে দেরি হল না। যেন তেরো চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে শুয়ে আছে। ক্লান্ত, অবসন্ন, ভঙ্গুর! নিষ্প্রাণ একটা দেহমাত্র!

এ কি হয়েছে তার!

আমাকে দেখে একটু উজ্জ্বল হল অদ্রির মুখ চোখ। ক্ষীণ ক বললে, "সন্দেহ ছিল তুমি এতদিন আদৌ এ দেশে আছ কি না। তঃ একটা চান্স নিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। বস।"

আমি ডিভানে বসে বললাম, "এ কি ব্যাপার মিস ব্রাউন ?' হয়েছে তোমার ? তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না।"

অড্রির মা বললেন, "ও তোমাকে চিঠি দিতে বলেছিল। বড় জরুরী দরকার।"

"কিন্তু কী হয়েছে ওর বললেন না তো? এই ক'মাসের মধ্যে, ওর এই চেহারা হল কি করে?"

"ক্যান্সার!"

"ক্যান্সার! কোথায়? কবে হল?"

"ব্রেস্ট-এ। দুটোতেই। আগে ধরা পড়েনি। যখন ও নিজে বুঝেছে তখনো বলেনি। চেপে গেছে। দার্ঘ চার মাস চেপে রেখেছে, ঐ নিয়ে কাজ করেছে, হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের সেবা করেছে। জানাজানি হলে ওকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে, চাকরী যাবে, উপার্জন বন্ধ হবে, সেই ভয়ে ও আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছে সব। কাউকে বলেনি রোগের কথা। বুঝতে দেয়নি রোগের যন্ত্রণায় কাতর হলেও!"

মিসেস ব্রাউন আর পারলেন না বলতে, কাঁদতে লাগলেন। তারপর কিচেনে চলে গেলেন।

আমি তাকালাম অড্রির দিকে।

অড্রি বললে, "অপারেশন হয়ে গেছে। ভাল অপারেশন হলেও যে রোগী বাঁচবে এমন ভবিষৎবাণী কেউ করতে পারে না। তাই জীবনের আশা কম!"

আমি কি বলবো ভেবে পেলাম না।

সে বললে, "আদিত্যকে তুমি চেন?"

"কোন আদিত্য? ডঃ আদিত্য রায়? যে এখানে এফ-আর-সি-এস ?রতে এসেছিল?"

"হ্যাঁ।" একটু দম নিয়ে অড্রি বললে, "তোমাকে ও সুজিতকে দ খুব ভাল করে চিনতো। প্রায়ই তার কাছে তোমাদের কথা ?নতাম।"

বললাম, "তোমার সঙ্গে তার বুঝি আলাপ ছিল?"

ম্লান মুখে অদ্রি বললে, "আমরা এনগেজড্। ও দেশে ফিরে গেছে গত বছরে। সেখানে চাকরী পাকা হলে সে একবার এখানে আসবে বলে গেছিল; এলে বিয়ে হবে ঠিক ছিল।" একটু দম নিয়ে ম্লান হাসল অদ্রি, "কিন্তু এ অবস্থায় সে আর হবে না! ও চিঠি দিয়েছে সামনের মাসেই আসবে সাত দিনের জন্যে। বিয়ে করে আমাকে নিয়ে যাবে ভারতে। ওর চিঠি পেয়ে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছি। ও কিছুই জানে না আমার রোগ সম্বন্ধে! কিছুই জানাইনি আমি এতদিন।"

অদ্রি চুপ করল, আমি কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলাম।

সে বললে, "ওর চিঠি তোমাকে মা দেখাবে তাতে ওর ঠিকানা আছে। ওকে তুমি লিখে দিও সব জানিয়ে। এখানে তার আসার আর দরকার নেই।" চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটল। নীরবে কাঁদতে লাগল সে। এ অবস্থায় আমি কিছু বলতে পারলাম না। এমনই আকস্মিক ব্যাপার, এতই অপ্রত্যাশিত ঘটনা—যে তখনো পর্যন্ত আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি! এ যে কল্পনারও অতীত ছিল!

আদিত্য খুব ভাল ছাত্র ছিল, বড় ঘরের একমাত্র ছেলে। বম্বের মেডিকেল কলেজ থেকে খুব ভাল ফল করে এখানে এসেছিল এফ. আর. সি. এস হতে। পড়াশুনো নিয়েই থাকতো। এখন মনে পড়ল সে চেয়ারিংক্রশ হাসপাতালের সঙ্গে কিছুকাল সংযুক্ত ছিল তখনই হয়তো অদ্রির সঙ্গে তার পরিচয় ও প্রেম পর্ব! কই আদিত্য তো কখনো আমাকে বা সুজিতকে এ সব বলেনি! খুব চাপা স্বভাবের স্বল্পবাক ছিল সে! তাকে কখনো কখনো দেখতাম ইণ্ডিয়া হাউসের ক্যান্টিনে, দিশী রান্না খেতে আসতো একাই। অন্যত্রও দেখেছি, অদ্রিকে দেখিনি সঙ্গে। আমার বাঙালী ডাক্তারের বাড়িতেও প্রায় যেতো সে।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল, অড্রি বললে, "আদিত্যকে তো জানো, খুব সিরিয়াস ছেলে। ও ওর চাকরীটা পাকা না করে বিয়ে করতে চায়নি। বম্বেতে খুব ভাল কাজ পেয়েছে সে। জাসলোক হাসপাতাল না কি! লিখেছে সে কথা চিঠিতে! মোটা মাইনে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর সুবিধা। লিখেছে আমাকেও সে জাসলোক হাসপাতালে নর্সিং এর কাজ দিতে পারে যদি আমি চাই।"

কথা বলতে অড্রির কষ্ট হচ্ছিল খুব। বললাম, "তুমি বেশি কথা বল না অড্রি। আমি ওর চিঠি তোমার মার কাছ থেকে নিয়ে পড়ে দেখবো। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না তোমার এই অবস্থা হয়েছে! কেন তুমি নিজেকে এ ভাবে শেষ করলে! কেন তুমি নিজে একজন নর্স হয়ে, হাসপাতাল ও ডাক্তারদের মধ্যে থেকেও সময়ে কিছু করলে না! এখানকার ফ্রী ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের এত বড় সুযোগ নিলে না! এটা কি তোমার আত্মহত্যা নয়। মূঢ়তা নয়?"

অড্রি বলল, "অবশ্য গোড়ায় ধরতে পারিনি। বুকে ব্যথা হতো, একটা ছোট ফুসকুড়ির মতো হয়েছিল, অত ভাবিনি, ভেবেছি ফোড়া, রে ভেবেছি ম্যালিগনান্ট গ্রোথ। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি এই আকার নেবে বুঝতে পারিনি, যখন পারলাম তখন অনেক দেরি য়ে গেছে। দুটো ব্রেস্টেই ছড়িয়ে পড়েছে। মার কথা ভেবে চেপে গেছিলাম, তারপর—"

থেমে গেল সে। কথা বলতে তার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিল এই ভাবে ওকে দেখতে। অপারেশনে দুটি স্তনই বাদ গেছে; আর কোথাও যদি রোগ সংক্রমিত না হয়, তাহলে ও হয়তো বেঁচে থাকবে আরো কয়েকটা বছর যদি সে পায় সুচিকিৎসা, সেবা, বিশ্রাম ও মনের শান্তি। এ সব পাবে কি সে? বাড়িতে ঐ তো তার বৃদ্ধা পঙ্গু মা। রোজগার তো ঐ একার ছিল সংসারে।

অড্রি বললে, "তুমি আদিত্যকে সব বুঝিয়ে লিখে দাও প্লীজ। ও যেন না আসে। আমার আশা ত্যাগ করে—ও যেন ওর দেশেরই কোনো মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়। ও আসলে আমি কিন্তু বিষ খেয়ে সত্যিই আত্মহত্যা করবো!"

কাঁদতে লাগল অড্রি। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলাম। ওর মাথার কাছে রাখা টেবিলের ওপর ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের একটি ছবি, পাশের ছোট ফ্রেমে আদিত্যর।

একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম। একে কি বলবো আত্মহত্যা! সংসারের প্রতি কর্তব্যবোধ! মূঢ়তা!

বিচিত্র নারী-মন!

এরপর আর খবর নিতে পারিনি তার, জর্মনীতে চলে গেছি।

অনেক কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, দেশেও ফিরে এসেছি বহুদিন হল। এখনো যখন কোনো হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাই অথবা ক্যান্সার রোগের কথা কাগজে পত্র পত্রিকায় পড়ি, রেডিওতে শুনি, টিভিতে দেখি—তখনই একটি মাত্র ম্লান অবসন্ন নিষ্প্রাণ মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে—সে মুখ অড্রি ব্রাউনের!

'পাব-এ প্রতিবিম্ব'

মেয়েটি খুব আস্তে কথা বলছিল, এত আস্তে যে হয়তো তার সঙ্গীটিও সব কথা ভাল করে শুনতে পাচ্ছিল না। পাশের টেবিলে বসে আমিও প্রায় কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না।

অবশ্য য়ুরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে সকলেই আস্তে কথা বলে থাকে। তাই আশ্চর্য হবার মতো ঘটনা নয়।

কিন্তু আশ্চর্য হলাম একটু পরেই। মেয়েটির গলার পর্দা হয়তো একটু চড়ে থাকবে, অথবা তার কথার টুকরোগুলি শুনতে শুনতে আমার শ্রবণ-শক্তি একটু বেড়ে থাকবে। তাই ফাঁকে ফাঁকে তাদের কথা শুনতে পেলাম।

মেয়েটি বললে, (হ্যাঁ, বলা হয়নি তার সঙ্গীটি আমার স্বদেশীয়, মেয়েটি খাঁটি ইংরেজ) "তুমি এমনি করে সব দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পার না। য়ু সিম্প্‌লি কাণ্ট্‌, প্রদীপ!"

ছেলেটিও নীচু গলায় উত্তর দিল, "আহা, দায়িত্ব এড়াচ্ছি কোথায়? একে কি দায়িত্ব এড়ানো বলে?"

মেয়েটির ধীর কণ্ঠের ঝাঁঝালো উত্তর, "অবশ্যই বলে! হোয়াট এল্‌স্‌ দেন!"

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। ঢিমে আলো পরিবেশিত সিগারেট পাইপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন প্রায় অন্ধকার হলের এক কোণে দুটো পাশা-পাশি টেবিলে ওরা দুজন ও আমি একলা। ওদের সামনে দুটি বোতল ও গেলাস আর কিছু স্ন্যাক্‌স্‌। কিন্তু ওরা খাচ্ছে না। মেয়েটি ছুরি কাঁটা নাড়ছে, গেলাস নাড়ছে, কখনো সরিয়ে রাখছে। ছেলেটির মুখে ধূমায়িত পাইপ।

লণ্ডনের ট্রাফ্‌ল্‌গার স্কোয়ারের কাছে শীতের সন্ধ্যায় এক পাবে-এ সময় কাটাচ্ছি।

ঘড়ির দিকে তাকাতে গেলাম হাতের আস্তিনটা সরিয়ে, কিন্তু সময় দেখা হল না। কানে এল মেয়েটির গলা, "আমি কিন্তু কোন কথা শুনতে চাই না। তোমার কথায় অনেক দূর এগিয়েছি, এখন থামা অসম্ভব। অনেক দেরী হয়ে গেছে।"

ছেলেটি জবাব দিল না, বা কি বলবে হয়তো ভাবতে লাগল। মেয়েটি আবার বললে, "দীর্ঘ তিন বছর এমনি চলছে। তোমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম বলেই আমার বাবা মাকে বোঝাতে পেরেছিলাম, নইলে তাঁরা—"

তার কথার মাঝখানেই ছেলেটি বললে, "একজন কালো লোকের সঙ্গে মিশতে দিতেন না! কি বল!"

মেয়েটি মুখ তুলে ছেলেটির দিকে তাকাল। সে আমার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল, তাই তার চেহারা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে মেয়েদের পিছন থেকে দেখলেও বলে দেওয়া যায় তাদের গড়ন কি রকম! তাই মনে হচ্ছিল সে সুন্দরীই হবে। মুখশ্রী কি রকম সেটা অবশ্য বলা সম্ভব নয়।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল তার সঙ্গীর দিকে। তার দৃষ্টিতে ক্রোধ বা ঘৃণা কোন রসের প্রাবল্য ছিল বলতে পারি না, তবে ছেলেটি মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে নিল, তারপর তার দৃষ্টিটাকে হলের অন্যত্র দেবার চেষ্টা করল।

"লুক এ্যাট্ মি প্রদীপ, আমার দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা কর না!"

ছেলেটি আবার পাইপটা তুলে মুখে নিল, বোধ হয় তাতে কিছু আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আনবার চেষ্টা করল, অথবা সাহস!

মেয়েটি বললে, "তুমি জানো আমার বাবা মা কি ধরণের লোক! তা সত্ত্বেও তুমি এ-ধরণের কথা বলতে পারলে!"

ছেলেটি উত্তর দিল, একটু অনুতপ্ত কণ্ঠেই, "আই ডিড্‌ন্ মীন্ ইট, রিয়ালি! ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা তোমাকে করা যায় না প্রদীপ। বাবা-মার কথা থাক,

আমি তোমাকে এত প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, সে তো সব কিছু তোমার প্রতিশ্রুতির, তোমার ছল চাতুরির ওপর বিশ্বাস করেই !"

"বিশ্বাস কর, ছল চাতুরী এর মধ্যে কিছু ছিল না। ভাবতে পারিনি এমনটা দাঁড়াবে আমাদের সম্পর্ক !"

"অর্থাৎ কিছুদিন ফুর্তি করে সরে পড়তে চেয়েছিলে ! ভালবাসার, ভাল মানুষীর ফাঁদ পেতে বোকা বানিয়েছিলে আমাকে নিজের জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে !"

ছেলেটি কি বলতে গেল, বলতে পারল না মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে।

তুজনেই চুপচাপ, সময় বয়ে চলল।

ওয়েটার এসে দাঁড়াল আমার সামনে। তার দিকে তাকিয়ে হাতের খালি গেলাসটা দেখালাম। সে বললে, "আর নয় স্যার। অনেক বেশী খেয়েছেন।"

"সো হোয়াট !" ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বললাম, "গেট মি এনাদার ড্রিন্‌ক্ ! আর একটা রাম দাও। একটা—"

ওয়েটার কিছু না বলে চলে গেল !

পাশের টেবিলের দিকে তাকালাম। কি আশ্চর্য ! ওরা কোথায় গেল ! কখন চলে গেল ! দেখতে পেলাম না কি রকম !

"ওয়েটার !" বেশ জোরেই হাঁক দিলাম। শব্দটা আমার কানেও কড়া বাজল। আশপাশের লোকজন আড়চোখে হয়তো তাকাল, জানি না। প্রায় অন্ধকার হলে লোকজনের মুখ ভাল করে দেখা যায় না।

ওয়েটার এসে দাঁড়াল।

বললাম, "ওরা কোথায় গেল ?"

"কারা স্যার ?"

"যে তু'জন আমার পাশের টেবিলে ঐখানে বসে খাচ্ছিল······না না খাচ্ছিল না, কথা বলছিল !"

সে টেবিলটা একেবারে কোণের, আমার টেবিল না পাশ কাটিয়ে কেউ ওদিকে যেতে আসতে পারে না।

ওয়েটার কি বুঝল, জানি না। কিন্তু কোনো কথা বলল না।

"কি হল! তারা কোথায় গেল?"

"ঐ টেবিলে তো কেউ বসেনি স্যার। ওটাতে তো গত দু'ঘণ্টার মধ্যে কেউ বসেনি!"

"কি বলছ তুমি! এতক্ষণ তারা বসেছিল! আমি তাদের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম! তারা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে কখনো! আস্ত দু'টি মানুষ!"

ওয়েটার কোনো জবাব দিল না। আমার খালি গেলাস ও বোতল নিয়ে চলে গেল।

চেঁচিয়ে আবার ডাকতে গেলাম ওয়েটারকে। হঠাৎ থেমে গেলাম, মনে পড়ল আজ সন্ধ্যের সময়ে সুসানকে সঙ্গে নিয়ে ইলিং-এ তার বাবা মার কাছে যাবার কথা। তাঁদের সঙ্গে সুসান আমার পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিল! কথা ছিল পিকাডিলি সার্কাস টিউব ষ্টেশনে টিকিট কাউণ্টারের সামনে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে সে!

উইণ্ডমিল থিয়েটারের মেয়ে

অপূর্ব বাজনার তালে তালে নানা ভঙ্গিমায় মেয়েরা নাচছিল; তাদের সুন্দর দেহের বাঁকে বাঁকে উঠছিল লাস্যের ব্যঞ্জনা; নেপথ্য থেকে বিচ্ছুরিত রঙিন আলোর দোলায় দুলছিল তাদের যৌবন-দৃপ্ত দেহ, আর সেই সঙ্গে দুলছিল হল-ভর্তি দর্শকের মন!

লণ্ডনের প্রখ্যাত 'উইণ্ডমিল থিয়েটারে' প্রদর্শনী দেখছিলাম বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে।

পুরুষ ও মহিলা দর্শকরা সেই নয়ন বিমোহন নাচ উপভোগ করছিল। যে সব মেয়েরা ঘুরে ফিরে নাচছিল তাদের পরনের পোশাক নাম মাত্র। কটিতট ও বক্ষদেশ দু'টুকরো কাপড়ের ফালিতে আবরিত। যে ক'টি মেয়ে মঞ্চ জুড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে, তাদের বক্ষ আবরণহীন; কটিতে কিছু ছিল কি না বোঝা যাচ্ছিল না, তাদের হাতের বড় ময়ূরপুচ্ছের পাখা সামনে ঢাকা। কোনো বিশিষ্ট ভাস্করের হাতে গড়া মূর্তির মতো মনে হচ্ছিল তাদের।

দেখছিলাম 'সেক্স'কে আর্টে পরিণত করার বিস্ময়কর পরিকল্পনা! প্রায় উলঙ্গ মেয়েদের দেখেও পুরুষ দর্শকদের মনে কোনো কামের উত্তেজনা জাগছিল না। সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি তাদের ওপর; সবাই উপভোগ করছিল জীবন্ত আর্টের সার্থক রূপ।

একে একে অনেকগুলি অনুষ্ঠান হল; তারপর মাইকে ঘোষিত হল সে রাতের বিশেষ অনুষ্ঠান—একটি ছোট নৃত্য-নাট্য।

সঙ্গে সঙ্গে কনসার্টের বাজনা দিয়ে শুরু হল সে নাটক। ছ'জন মেয়ের সঙ্গে নাচতে নাচতে যে নায়িকা প্রবেশ করল মঞ্চে এবং একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে এসে নত ভঙ্গিতে দাঁড়াল—তাকে দেখে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম। অত্যন্ত চেনা মুখ।

হাতের প্রোগ্রামে মেয়েদের মুখের ছবিগুলি দেওয়া ছিল, সেই সঙ্গে তাদের নাম। সেটি দেখতে চোখ পড়ল একটি মুখের ওপর, নীচে যে নাম লেখা সে নাম যে তার নয়, সে কথা জানতাম। কারো আসল নামই এখানে দেওয়া নেই। কিন্তু ছবির মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়েই হঠাৎ তার নাম মনে পড়ে গেল। সে আইলিন!

কিন্তু আইলিনকে এখানে এই পরিবেশে এই পোশাকে নাচতে দেখবো এ যে কল্পনার অতীত! তাই সন্দেহ জাগল মনে। ওর মতোই দেখতে অন্য কেউ হবে। এমন সাদৃশ্য থাকা সম্ভব হতেও পারে হু'টি মেয়ের মধ্যে!

সারা মঞ্চ জুড়ে সে নেচে চলেছে; ভাবে, ব্যঞ্জনায় উচ্ছল তার মুখ; ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা। পাদপ্রদীপের সামনের সারিতেই বসেছিলাম, তাই তার মুখের প্রতিটি রেখা সেই উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

সামনের দিকে নাচতে নাচতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, পায়ের ছন্দ গেল কেটে, দেখলাম তার স্থির দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ। তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা মিলিয়ে গেছে, মুখে-চোখে একটা আতঙ্কিত ভাব। কিন্তু সে মূহুর্তের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলিয়ে নিল, আবার সে ঘুরতে লাগল ছন্দে ছন্দে মনের আনন্দে আগের মতোই।

আমি এবার নিঃসংশয় হলাম। আইলিনই। অবাক হয়ে ভাবছিলাম তার কথা। গত বছর এই সময়তেই তাকে একেবারে ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন পরিবেশে দেখেছিলাম; শুধু দেখিনি, তার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ পরিচয়ও হয়েছিল। হয়েছিল কিছু ঘনিষ্ঠতাও।

নৃত্য-নাট্য শেষ হল। আমি সঙ্গে সঙ্গে হল থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন অন্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে। আমি বাইরে এসে স্টেজে ঢোকার দরজায় দাঁড়ালাম, সেখানে একটি বুড়ী চেয়ারে বসেছিল। উইণ্ডমিলের কর্মচারী। তার সামনে হাতের প্রোগ্রাম মেলে আইলিনের

ছবি দেখিয়ে বললাম, 'মাসী, আমি এর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। তুমি দয়া করে তাকে একটা খবর দেবে?'

আমি পকেট থেকে কলম ও একটা কাগজের টুকরো বার করলাম আমার নাম লেখার জন্যে।

বুড়ী ছবিটা দেখে বললে, 'নজর পড়েছে বুঝি বাছা? ওর ওপর সকলেরই নজর পড়ে। নজর পড়ার মতো চেহারা।'

হেসে বললাম, 'বুঝতেই পারছ। এই নাও, এই স্লীপটা তাকে দাও, প্লীজ।'

'ও সব আমি পারব না বাপু।'

বললাম, 'ও আমার দীর্ঘদিনের চেনা। তুমি তাকে এটা দাও, কোনো চিন্তা নেই।'

সে বললে, 'সবাই বলে চেনা। কিন্তু এখানে এ ভাবে দেখা করা বা খবর দেওয়া বারণ; ম্যানেজার দেখলে আমার চাকরী যাবে।'

'আমার যে তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে মাসী, তুমি ইচ্ছা করলেই হবে।'

'কি যে করো বাপু! দাও, দেখি স্লীপটা!' সে স্লীপটা নিয়ে চলে গেল ভিতরে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, একটু পরেই সে ফিরে এল, বললে, 'এই নাও জবাব।'

আমার স্লীপের পিছনেই ছোট্ট একটি লাইন লেখা, 'অপরিচিত কারো সঙ্গে আমি দেখা করি না, দুঃখিত'।

তার সেই লেখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি তার অপরিচিত! আমাকে কি সে চিনতে পারেনি! কিন্তু সামনাসামনি আমার ওপর তার চোখ পড়তেই তার ফর্সা মুখ কালো হয়ে গেল, পায়ের তাল গেল কেটে, অন্যমনস্ক হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যে থেমে গেল-সে কি তার নাচের অঙ্গ!

মনের মধ্যে দ্বিধা নিয়ে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলাম। পিকা-ডিলির অলিগলি এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে চললাম। মন পড়ে রইল পিছনে; চোখের সামনে ভাসতে লাগল আইলিনের মুখ। তার সঙ্গে কাটানো গত দিনগুলির কথা বার বার মনে পড়ল।

তার উগ্র যৌবন যেমন পুরুষের মনে মাদকতা সৃষ্টি করে, তার চোখ-মুখ তেমনই মাধুর্যের স্বাদ এনে দেয় মনে। শিশুর মতো সরল, নিষ্পাপ একটি মন সেই উগ্র যৌবন-দৃপ্ত দেহ থেকে উঁকি মারে। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় তার পরস্পরবিরোধী এই দুই রূপের সংমিশ্রণ দেখে!

গত বছর গ্রীষ্মের অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে ও সেই সঙ্গে কিছু উপার্জনের জন্যে 'ন্যাশনাল য়ুনিয়ন অফ ষ্টুডেণ্টস্'-এর উদ্যোগে কেমব্রিজের কাছে এক ছাত্র-ক্যাম্পে ষ্ট্রবেরির ফসল তুলতে গেছিলাম। আড়াই'শ ছাত্র ও দেড়'শ ছাত্রী এসেছিল সেখানে য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উপার্জন হয়; দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রী এক সঙ্গে মিলিত হয়, বিষয় ও জ্ঞানের প্রসারতা ঘটে, দেশ ও ভাষার সীমা অতিক্রম করে তারা অল্প সময়ের জন্যে সার্বজনীন একটি ঐক্য খুঁজে পায় নিজেদের মধ্যে।

এই ছাত্রছাত্রীর ক্যাম্পে আমার মতো আইলিনও গেছিল। দেড়'শ ছাত্রীর মধ্যে যে ক'জন ছাত্রী সমস্ত ছাত্রদের মনোহরণ করেছিল, আইলিন তাদের একজন! আমেরিকান, সেখানকার কোনো এক কলেজের নৃত্যকলার ছাত্রী। নাচে আর গানে সে সকলকে মাতিয়ে রাখতো। ছাত্রদের দেহে-মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করতো তার দেহে যৌবনের তরঙ্গ তুলে।

ক্যাম্পের কোন ছেলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে সে নিজেকে গুটিয়ে নিত, বলতো, সে বাগ্‌দত্তা, তার ভাবী স্বামীও এই ক্যাম্পে এসেছে। কিন্তু সে যে কে তা বলতো না। সে কথা জানার উপায় সে রাখেনি। তাকে কোনো একজনের সঙ্গে বেশী সময় দেখা

যেতো না। সকলের সঙ্গে সে মিশতো, সামান্য ঘনিষ্ঠতাও করতো কারো কারো সঙ্গে, কিন্তু যদি কেউ আঁধার বুঝে নিরালা কুঞ্জ খুজে তাকে নিয়ে যেতে চাইতো, তখনই সরে পড়তো সে। সারা ক্যাম্পে আর কোনো আমেরিকান ছিল না, তাই সে সব দলের সঙ্গেই ঘুরতো নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। তার রূপ যৌবন যেমন ছেলেদের টানতো, তার কঠিন মন তাদের সরিয়ে দিত তেমনি দূরে।

সেই আইলিনকে আজ 'উইণ্ডমিল থিয়েটারে'র মঞ্চে প্রকাশ্যে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় নাচতে দেখে ভাবছিলাম তার এই পরিণতি কেমন করে হল। আমার সঙ্গে তার দেখা না করার অর্থ হল সে আমাকে ভাল করেই চিনতে পেরেছিল, তাই আমাকে সে ফিরিয়ে দিল।

আরো দু'দিন গেলাম থিয়েটার দেখতে। সামনাসামনি দেখলাম তাকে। সে-ও দেখল আমাকে, কিন্তু কোনো লক্ষণ তার চোখে-মুখে দেখলাম না যাতে বোঝা যায় সে আমাকে চিনতে পেরেছে।

তৃতীয় দিন আবার সেই বুড়ী মারফৎ তার কাছে স্লীপ পাঠালাম। যথারীতি সেটি এক লাইনের জবাবে ফেরৎ এল। সে দেখা করল না।

অগত্যা তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। যদিও মনের মধ্যে অদম্য কৌতূহল রয়ে গেল।

বেশ কিছুকাল পরে এক রাত্রে সোহো পল্লীর এক রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, দেখি সামনেই একটি ট্যাক্সি এসে থামল, তার ভিতর থেকে নামল আইলিন। ট্যাক্সির মধ্যে একটি পুরুষ বসে। আইলিন নেমে যেতে পুরুষটি ট্যাক্সিতে চলে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে আই-লিনের পিছনে গিয়ে বলে উঠলাম, 'আজ তুমি পালাতে পারবে না আইলিন!'

সে চমকে পিছনে ঘুরে দাঁড়াল। বিমূঢ় দৃষ্টি তার। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'কি চাও ?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কিন্তু আমি—'

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'আমি যে তোমার খুবই পরিচিত সেটা নিশ্চয়ই এখন অস্বীকার করবে না ?'

সে চুপ করে রইল।

বললাম, 'আজ তোমাকে ছাড়ছি না। রীতিমতো নাটকীয় ব্যাপার ! জানতে চাই তোমার এই পরিণতি কেন !'

আইলিন প্রথমে কোনো উত্তর দিল না, পরে বললে, 'জেনে তোমার লাভ ?'

'কিছু নয়, একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। তুমি জানো আমি লেখক। লেখার খোরাক হবে। সেই লাভ !'

সে বললে, 'এখানে কথা বলা সম্ভব নয়, কোনো রেস্তোরায়—'

'এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া হোটেল রেস্তোরাঁয় হবে না। অনেক কথা আছে। আমার ঘরে যাবে ?'

সে আতঙ্কিত হয়ে বললে, 'না ! না !'

'না কেন ? এইমাত্র তো দেখলাম একজন খদ্দের তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। যে ব্যবসায়ে নেমেছ তাতে ভয় বা লজ্জা কিসের ? বিশেষত আমি তোমার পূর্ব-পরিচিত !'

সে মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আমার ঘরে বরং চল। কিন্তু সে তো অনেক দূর-রিচমণ্ড। সেখান থেকে এত রাতে তোমার হ্যাম্পস্টেডের বাসায় ফিরতে সরাসরি কোনো বাস বা টিউব পাবে না।'

'আমি যে হ্যাম্পস্টেডে থাকি—সেটা মনে আছে দেখছি ! ক্যাম্পে তোমার ডায়েরীতে আমার ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিলাম বটে ! তুমিও ওয়াশিংটনের একটা ঠিকানা দিয়েছিলে, ভুয়ো অবশ্য। তিনখানা চিঠির একটার-ও জবাব পাইনি, চিঠিগুলি ফেরৎ এসেছিল।'

আইলিন বললে, 'তোমার ফেরার কিন্তু খুব মুশকিল হবে!'

'তাতে কি! আজ ফিরবো না। বরং রাতটা তোমার মতো এক রূপসী যুবতীর সঙ্গে বেশ মৌজেই কাটবে, কি বল?'

'না।'

'কি না?'

'আমার ঘরে তোমার রাত কাটানো চলবে না। সে কথা আগেই বলে রাখছি।'

'আহা, তার জন্যে পয়সা পাবে। ভাল দক্ষিণা দেব। পরিচিত বলে বিনা পয়সায় কিছু চাইব না। উলঙ্গ নাচিয়ে মেয়ে তুমি, তুমি তো সতী নও! হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার সেই ভাবী-স্বামী যাকে ক্যাম্পে কোনোদিন দেখিনি, কোথায় সে? বিয়ে না করে সরে পড়েছে নাকি? না ডিভোর্সড্? না, সেটাও ভুয়ো?'

সে কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, 'চল, লেস্টার স্কোয়ার টিউব স্টেশন দিয়ে যাওয়া যাক।'

রিচমণ্ডে নেমে একটু হেঁটে আইলিনের ঘরে তার সঙ্গে ঢুকলাম। আলো জ্বেলে রেন কোট খুলতে খুলতে সে বললে, 'ঐ চেয়ারটায় বসো।'

চেয়ে দেখলাম, নীল টাফেতার গাউনের মধ্যে দিয়ে তার উগ্র যেবন ফুটে বেরোচ্ছে; কিন্তু মেক আপ করা মুখ-চোখ বিবর্ণ, বিষণ্ণ, ক্লান্ত। মনে হচ্ছে তার মসৃণ কোমল দেহের ওপর দিয়ে যেন শতাব্দীর ঝড় বয়ে গেছে।

সে খাটে বসে বললে, 'কি জানতে চাও?'

'সব।'

'কিন্তু এত কথা বলতে গেলে তোমার দেরি হয়ে যাবে। টিউব আর পাবে না। আধ ঘণ্টা পরে শেষ বাস ছাড়বে রিচমণ্ড ষ্টেশন থেকে। সোজা হ্যাম্পস্টেডে যাবার, সেটা না ধরতে পারলে—'

'এখানে রাত্রিবাস, এই তো! সেটা আমার পক্ষে স্বর্গবাস! তোমার চিন্তা নেই।'

আইলিন বললে, 'তোমাকে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, সে হবে না। হবে না।'

তার দৃঢ়তায় অবাক হয়ে তাকালাম তার দিকে। তার চোখের কোণ ভিজে, বিন্দু বিন্দু জল জমছে সেখানে।

কয়েক মূহূর্ত তার দিকে চেয়ে বললাম, 'তুমি কাঁদছ আইলিন?'

সে রুমালে চোখ মুছে বললে, 'কোথা থেকে শুরু করবো বল।'

'ক্যাম্পে যাবার আগে তুমি সত্যিই আমেরিকায় থাকতে এবং সেখানে ছাত্রী ছিলে, না সে সব মিথ্যে?'

সে বললে, 'আমার মা ওয়াশিংটনের এক নাইট ক্লাবের ক্যাবারে-নাচিয়ে ছিলেন। আমি সেখানেই জন্মেছি, মানুষ হয়েছি।'

'আর বাবা?'

'আমার বাবা কে জানি না। য়ুরোপের কোনো ধনী ব্যক্তি হবেন, মা নাম বলেন নি।'

বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিলাম।

সে বলে চলল, 'আমার জন্মের তিন মাসের মধ্যে মা মারা যান আমাকে একজন অনাথ-আশ্রমে দিয়ে দেয়, সেইখানেই আমি মানুষ।'

'তোমার মার কি হয়েছিল? হঠাৎ মারা গেলেন?'

'সিফিলিস হয়েছিল তাঁর।'

'তারপর?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তারপর বড় হয়ে নানা জায়গায় নাচ শিখলাম। আর জীব- ধারণের জন্যে মার ব্যবসাতে নাম লেখালাম।'

'ক্যাম্পে গেলে কি করে? ইংলণ্ডে এলে কি করে?'

'এক ধনীর রক্ষিতা হয়ে ছিলাম কিছুদিন, সে-ই লণ্ডনে নি- আসে, তারপর ছেড়ে চলে যায়। এখানেও ঐ ব্যবসায়ে যোগ দিলাম একদিন আমার কাছে এল একটি ছেলে, ইংরেজ ছাত্র। তার কা-

দেখলাম একটি ছাপানো পুস্তিকা 'লেণ্ড্ এ হ্যাণ্ড্ ইন দি ল্যাণ্ড'। ছাত্র-ক্যাম্পের কথা শুনলাম তার কাছে। এক সুন্দর পরিবেশ আর জগৎ—যে জগতে নারীদেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নেই, নেই অর্থের বিনিময়ে দেহ নিয়ে পুতুল খেলা! নিজের ঐ ছোট বয়সেই এই খেলায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। মুক্তি চাইতাম ঐ কলুষিত ঘৃণ্য জীবনের হাত থেকে! ইচ্ছে হতো বেরিয়ে আসি। পালিয়ে যাই, কখনো ইচ্ছে হতো যারা আমার যৌবনকে তাদের কামনার একটি প্রাণহীন জড় পদার্থ মনে করে, আমার মনটার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র করে না, সেই নরপশুদের খুন করি!'

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম আইলিনের কথা। সে থামতে বলে উঠলাম, 'এ ব্যবসা ছেড়ে দিলে না কেন?'

'ছেলে বেলায় বুঝতাম না, ধরতেও পারিনি, কিন্তু বড় হয়ে বুঝলাম মার রোগ আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তে অণুতে পরমাণুতে বাসা বেঁধেছে! আমার আর পরিত্রাণ নেই।'

আমি বললাম, 'আর ক্যাম্প?'

'সেই ছেলেটির মুখে শোনা ক্যাম্পের সুন্দর জীবনের কথা, ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিচিত্র মধুর জীবনের ছবি আমার মনকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করেছিল, একবার এই নরক থেকে কয়েকটা দিনের জন্যেও সেই স্বর্গে যেতে দুর্বার ইচ্ছা জাগল মনে! এখানকার এক আর্ট স্কুলে নাম লিখিয়ে ছাত্রী সেজে ক্যাম্পে যাবার ছাড়পত্র পেলাম। সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা।'

আমি চুপ করে রইলাম। মনটা হয়ে উঠল ভারী। কি বলবো ভেবে পেলাম না। সে বললে, 'ঐ ক্যাম্পের পাঁচ সপ্তাহের প্রতিটি মূহূর্ত আমার জীবনের পরম সম্পদ। পরম প্রিয় সেখানকার অগণিত ছেলে মেয়ের প্রীতি, বন্ধুত্বের স্মৃতি! আমার এই ঘৃণ্য জীবনে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বাদ! বিধাতার অমূল্য আশীর্বাদ!'

আমি চুপ করে তাকে দেখতে লাগলাম। মনের মধ্যে হাজারো

কথা আর চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল, আর কেবলই মনে হতে লাগল আমার সামনে এই যে অপূর্ব রূপ-যৌবনা নারী বসে আছে নত মুখে, তার দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা বিষ! বিষ তার ঠোঁঠে, বুকে, নোখে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে! বিষ-কন্যা আইলিন!

কিন্তু আশ্চর্য! এই বিষধর মূর্তি দেখে আমার একটুও ভয় করছে না! বরং তার প্রতি জেগে উঠছে শ্রদ্ধার ভাব! মন বলছে কোথায় বিষ! এ যে অমৃত! এ যে স্বর্গীয় সুধা! এর দেহের প্রতিটি কোষে অণুকোষে সে অমৃত প্রবাহিত হচ্ছে, সেই সুধা বর্ষিত হচ্ছে!

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ! বেদনায় পূর্ণ হয়ে গেল মন। কেবলই মনে হতে লাগল নিপুণ ভাস্করের গড়া সৃষ্টি শুভ্র অনন্য-সুন্দর নারীদেহ, তার মধ্যে যতখানি উগ্র যৌবন, তত উগ্র তার দেহের বিষ! মন তার ঠিক ততখানি সুন্দর!

চলে যেতে পারলাম না, তার কাছে এগিয়ে গেলাম, পিছনে দাঁড়িয়ে বললাম, "আইলিন, তুমি এ পেশা ত্যাগ কর। অন্য কিছু কর।"

"কি করবো বল? লেখাপড়া তো শিখিনি কিছু। অন্য কাজও না। কারো বাড়াতে ঝি-এর কাজ আমি করতে পারবো না, নর্সিংও না। এ সব করে কোথাও রোগ ছড়াতে পারবো না!"

"রোগ তো তুমি প্রতিদিন অনেক পুরুষের দেহে সঞ্চারিত করছো আইলিন! অর্থের জন্যে তুমি কেন তা করছো?"

আইলিন পিছন ফিরেই দাঁড়িয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। প্রবল কান্নায় তার শরীর কাঁপতে লাগল।

এর পর কয়েকদিন কেটে গেছে। আইলিনের আর দেখা পাইনি উইণ্ডমিল থিয়েটারে কয়েকবার গিয়েও। বুড়ার কাছে জানলাম সে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে।

তার কথা ভুলতে পারছিলাম না। বারবার ইচ্ছে হতো রিচমণ্ডে তার বাড়িতে যাই। থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে সে কি করছে, কেমন আছে জানার আগ্রহ ছিল। কিন্তু তার নিষেধ আমাকে তার কাছে যেতে বাধা দিত। তাই যাওয়া হল না।

এমনি করে কেটে গেল আরো কয়েক সপ্তাহ।

একদিন ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। আইলিনকে স্বপ্নে দেখলাম। মনে হল সে যেন আমাকে ডাকছে, দেখা করতে বলছে তার সঙ্গে। তার চেহারার মধ্যে রোগের চিহ্নও দেখলাম না। সম্পূর্ণ নিরোগ সুস্থ ও প্রাণবন্ত দেখলাম তাকে।

সেদিন ইস্টারের ছুটি ছিল। তাই তার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ বেড়ে গেল, আমি প্রাতঃরাশের পরেই রিচমণ্ড যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। কেন জানি না মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা দেখা দিল তার কাছে যাবার জন্যে। স্বপ্নের কথাটা বারবার মনে পড়ছিল।

ওর জন্যে ইস্টারের ডিম ও কেক কিনে নিলাম এক দোকান থেকে।

রিচমণ্ডে আইলিনের ফ্ল্যাটে পৌছে দেখলাম তার ঘরের দরজা অল্প খোলা।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। সামনের জানালার পাশে রাখা সোফায় আইলিন বসে আছে দরজার দিকে মুখ করে।

আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার দিকে তার দৃষ্টি। সে নির্বাক হয়ে বসে রইল।

বললাম, "আজ ভোর রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম আইলিন। মনে হল তুমি যেন ডাকছো! সত্যি ডাকছিলে নাকি ঘুমের ঘোরে?"

আইলিন তবু নিরুত্তর।

একটু অবাক হয়ে বললাম, "চুপচাপ স্ট্যাচুর মতো বসে আছ কেন ? কথা বলবে না নাকি ? না কি আমাকে চিনতে পারছো না ?"

তবু আইলিন নীরব।

হঠাৎ একটা সন্দেহের ছায়া পড়ল মনে। বিস্মিত হয়ে আমি আইলিনের কাঁধে হাত দিলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা দেহ সোফার ওপর ঢলে পড়ল।

আতঙ্কে আমি চিৎকার করতে গেলাম। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমার সামনে আইলিনের নিঃস্পন্দ দেহ তেমনি পড়ে রইল, আমি মুহূর্তের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময়ে দেখি একজন পুলিস অফিসার ওপরে উঠে আসছে। রাস্তার ওপরে এ্যামবুলেন্স দাঁড়ানো, তার মধ্যে থেকে স্ট্রেচার নিয়ে লোক নামছে। ঐ বাড়ীর অন্যান্য কয়েক-জন বাসিন্দা বেরিয়ে আসছে তাদের ফ্ল্যাট থেকে।

কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। আইলিন কি আত্মহত্যা করল ? অথবা তাকে কেউ হত্যা করল ? নাকি মারাত্মক বিষ-রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল !

আজো জানি না সে কি ভাবে মারা গেল। মৃত্যুর পর কি তার রোগমুক্ত আত্মা আমার কাছে এসেছিল একবার !

আজো ভেবে পাই না আমি তার মৃত্যুর দিন ভোরে তাকে কেন স্বপ্নে দেখেছিলাম !

আনেৎ উপাখ্যান

লণ্ডনে এমন কুয়াশা দেখি নি কখনো।

দুঃসহ শীত পড়েছে; জানুয়ারী মাসের শুরুতেই শহরের ওপর নেমেছে মৃত্যুর মতো শীতল প্রবাহ। সেই সঙ্গে ক'দিন থেকে জমছে মেঘের মতন ঘন কুয়াশা। এমন ঘন যে দু'ফুট দূরের বেশী দৃষ্টি চলে না সে কুয়াশা ভেদ করে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পথ চলা দায়, প্রতি পদে সংঘর্ষের ও বিপদের ভয়। গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনা প্রতি মূহূর্তে। যানবাহন চলছে কম; অতি সন্তর্পণে। মানুষের চলার মতো গতি তাদের। দোতলা বাসগুলি যাচ্ছে অতি ধীরে। কখনো কখনো তার কণ্ডাক্টর বাসের আগে আগে হেঁটে চলেছে আর থেকে থেকে হাঁকছে, 'হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার।' ফগ লাইট জ্বলছে পথে-ঘাটে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে। এই ঘন কুয়াশায় একমাত্র হলদে আলোটুকুই যেন ভরসা।

কুয়াশা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মোহ ছিল। কুয়াশাকে মনে হতো রহস্যময়। প্রতিদিনের পরিচিত জগতে এ এক অন্য জগৎ! রোমাঞ্চ জাগে মনে। প্রতি পদক্ষেপে যেন সে জগতে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা, তেমনি নতুন অজানা তার প্রতিটি পদক্ষেপ। দিশেহারা হয়ে যেতে মন চায়! এই ঘন কুয়াশার জন্যে বাড়ীর রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অক্সফোর্ড সার্কাসের কলেজ থেকে কেন্টিশ টাউন বেশ দূর বৈ কি! কিন্তু নাইট ক্লাশ করে ক'দিনই হাঁটছি বাড়ী ফেরার সময়ে।

সেদিনো কলেজ থেকে বেরিয়ে রোজকার মতো হাঁটা শুরু

করলাম বাড়ী মুখো। সকালের কাগজেই বেরিয়েছে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা বাড়ার সম্ভাবনার কথা। পথ চলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। অন্ধের মতো পথ হাতড়ে চলেছি। যানবাহন আজ সম্পূর্ণ বন্ধ। এই সন্ধ্যে বেলাতেই পথ ঘাট প্রায় নির্জন। পুলিশের হুইসলের ধ্বনি থেকে থেকে বাজছে, আর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে পথচারীদের সতর্ক পদধ্বনি।

ওভারকোটের কলার তুলে দিয়েছি, গ্লাভস পরা দু'টি হাত খাতাশুদ্ধ ওভারকোটের লম্বা পকেটে ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে চলেছিলাম। খানিকটা চলার পর হঠাৎ মনে হল দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেই দরকার হবে দেশলাই। গ্যাস জ্বালাতে হবে। এই কুয়াশার রাত্রে বাড়ীর অন্য বোর্ডারদের দেশলাইয়ের জন্যে বিরক্ত করা উচিত হবে না। তাই ঠিক করলাম পথে কোনো 'পাব্' থেকে দেশলাই কিনে নেবো, কারণ সমস্ত দোকান পাট এখন বন্ধ একমাত্র 'পাব'গুলিই খোলা।

বি. বি. সি ছাড়িয়ে পোর্টল্যাণ্ড প্লেস ধরে চলতেই সামনে পড়ল একটি 'পাব্'। বন্ধ দরজার ঘষা কাঁচে 'সেলুন বার' লেখা ভালো করে পড়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না। সিগারেট ও পাইপের ধোঁয়ায় ঘরখানি আচ্ছন্ন। লোকজনের গুঞ্জন ও বোতলের গেলাসের ঠুংঠাং আওয়াজ। চোখ একটু সয়ে যেতে দেখতে পেলাম ঘর ভর্তি লোক বাইরের শীত ও কুয়াশার আক্রমণে সব এসে আশ্রয় নিয়েছে 'পাবে'। একপাশে জ্বলছে প্রকাণ্ড একটি চুল্লি। আগুন তাতে গমগম করছে। তার উত্তাপে ঘরখানি বেশ গরম, আর উষ্ণ পানীয়ের উত্তাপে গরম লোকগুলি।

দেশলাই কেনার জন্যে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াতেই সুশ্রী যুবতী বার মেড এগিয়ে এসে বললে, 'ইয়েস স্যার!'

এমন ভাবে সে জিগ্যেস করল, যে শুধু দেশলাই কেনার কথা

বলতে পারলাম না, মুখ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল, 'এ পাঁইট অব এল প্লিজ।'

বার মেডের কাছ থেকে এক মগ বিয়ার, এক প্যাকেট সিগারেট ও দেশলাই নিয়ে ঘরের চারদিকে তাকালাম। কোথাও বসবার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে আছে অনেকে।

এক কোণে বসেছিল এক বৃদ্ধা একটা বড় সোফা দখল করে। বৃদ্ধাটি আমাকে দেখে কাছে ডাকল, বললে, 'এস, বস এখানে।'

নিজে সরে জায়গা করে দিল বৃদ্ধাটি, একবার তার দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বসলাম পাশে।

বোধহয় ষাটের ওপর বয়স হবে বৃদ্ধার। বয়সের ও দারিদ্র্যের ভারে নুয়ে পড়া চেহারা! পরনে পুরোনো ওভারকোট, মাথার টুপি অনেকটা নামানো, গলায় স্কার্ফ জড়ানো। চিবুকে ও দু'গালে কুঞ্চিত রেখা।

ভালই হল, মনে মনে ভাবলাম—একটু গরম হওয়া যাবে। সাধারণত মদ খাই না। যথা সম্ভব এড়িয়ে চলি। কিন্তু আজ শীতের মধ্যে কু কড়ে বসে বিয়ার খেতে ভালই লাগল আমার।

বৃদ্ধা আমাকে দেখছিল, একটু পরে বললে, 'তুমি ইণ্ডিয়ান, না?'

'হ্যাঁ।'

'ইণ্ডিয়ার কোথায় বাড়ী তোমার?'

'ক্যালকাটা।'

'এখানে পড়ছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমি ছাত্র।'

সাধারণত ইংরেজ কথা বলে না অপরিচিতদের সঙ্গে। কিন্তু 'পাব-এ' বসে কয়েক পাত্র পানীয় উদরস্থ হলে তাদের মুখ খোলে। বৃদ্ধাটি ইংরেজ কি না বুঝতে পারলাম না। কারণ তার উচ্চারণ

খুব জড়ানো। চেয়ে দেখলাম বৃদ্ধার সামনে কোনো পানীয় নেই। হাতে শুধু সিগারেট।

বৃদ্ধা আমার দিক তাকিয়ে বললে, 'ভারতবর্ষে আমার ছেলে মারা গেছে। যুদ্ধের সময়ে সে গেছিল সেখানে। আমার একমাত্র ছেলে।' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃদ্ধাটি।

"আপনার আর কেউ নেই, স্বামী বা মেয়ে ?"

"না বাছা, সংসারে আমি একা !"

বৃদ্ধার কাহিনী শুনে মনটা ভারী হয়ে উঠল। আমার দেশে তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে জেনে আরো খারাপ লাগল।

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত ম্যাডাম।"

বৃদ্ধার চোখ দিয়ে জল পড়ল গড়িয়ে। ব্যথায় কাঁপছে তার ঠোঁট, হাত দু'টি মুঠো করে যেন চাপতে চাইছে কোনো এক অব্যক্ত যন্ত্রণা, দীর্ঘ দিনের অবদমিত বেদনা যেন উপছে উঠতে চাইছে তার সর্বাঙ্গে।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম। বৃদ্ধাও তাকিয়ে রইল অন্য দিকে।

নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে কিছু পরে বৃদ্ধা বললে, 'যদি কিছু মনে না করো তো একটা অনুরোধ করবো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'এক পাঁইট বিয়ার খাওয়াবে ?'

'অবশ্যই। বিয়ার, না অন্য কিছু ?'

'না বাছা, শুধু বিয়ার। ও সব জিন শেরীতে আমার সুবিধে হয় না।'

এক পাঁইট বিয়ার কিনে এনে টেবিলের ওপর রাখলাম। তারপর বৃদ্ধার পাশে নিজের জায়গায় এসে বসলাম। বৃদ্ধা তার দুঃখের কথা বলতে লাগল। তার স্বামীও মারা গেছে যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সে।

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধা পারল না নিজেকে শান্ত রাখতে। সোফায় হেলান দিয়ে রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। টুপিটা পড়ে গেল, তখুনি সে কুড়িয়ে নিল সেটি।

সমবেদনায় ভরে উঠল মন। বৃদ্ধার অন্তর্নিহিত বেদনা আমাকে স্পর্শ করেছে। বৃদ্ধার ছেলেটি মারা গেছে। ভারতবাসী দেখেই হয়তো বৃদ্ধা কাছে ডেকে বসতে দিয়েছে আমাকে। জানিয়েছে তার মর্মবেদনা। ভারতীয়র সংস্পর্শে এসেই বৃদ্ধার সংযম এমন করে ভেঙে গেছে।

সহানুভূতির সঙ্গে বললাম, 'আপনি শান্ত হোন।'

বৃদ্ধা কোনো কথা বলল না, চুপ করে চেয়ে রইল জ্বলন্ত চুল্লির দিকে।

এক সময়ে বৃদ্ধা দেওয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, 'আটটা বাজে!'

তার মাথার স্কার্ফ ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, টুপিটাও সরে গিয়েছিল মাথা থেকে খানিকটা। টুপি ঠিক করে পরে স্কার্ফটা ভাল করে বেঁধে নিল বৃদ্ধা মাথার ওপর দিয়ে।

তারপর এক চুমুকে মগের বাকী বিয়ার শেষ করে বৃদ্ধা বললে, 'আমাকে মাফ করো, এবার আমি উঠবো। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ পানায়ের জন্যে। তোমার অসীম দয়া।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ কথা বলবেন না। সামান্য এক পাঁইট বিয়ার।'

'শুভ রাত্রি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।' বলে বৃদ্ধা আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধার কথাই মন অধিকার করে রইল। মনে হল ঠিকানাটা জেনে নিলে ভাল হতো। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। তাকে সামান্য শান্তি দেবার চেষ্টা করতাম।

আমিও উঠে পড়লাম। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। দাঁড়াতে

গিয়ে পায়ের কাছে কি যেন ঠেকল। নীচু হ'য়ে যে জিনিষটা কুড়িয়ে নিলাম—আলোর নীচে তাকিয়ে দেখি সেটি সাদা পরচুলা ও বৃদ্ধার রুমাল।

বিস্মিত ভাবে সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকাতেই মনে হল ঠিক এই রকমই সাদা চুল যেন দেখেছি সেই বৃদ্ধার মাথায়! সাদা রুমালেও দেখলাম গোলাপী রং লেগে আছে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তার মাথার চুলগুলি কি সত্যিই সাদা নয়! সে কি তবে পরচুলা পরেছিল! তারপর কোনো এক সময়ে অসাবধানে তার অজ্ঞাতেই এটি গেছে পড়ে! সে তবে কি ছদ্মবেশে কোনো যুবতী! আর এই রুমাল! কাঁদতে কাঁদতে বারবার চোখের জল মুছছিল সে এই রুমাল দিয়ে। তাই কি তার মুখের রং লেগে গেছে এতে!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে কিছুক্ষণ; তারপর সেই পরচুলা ও রুমাল সেখানেই ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে গভীর বিস্ময় নিয়ে। হঠাৎ চমক ভাঙল বার মেডের কথায়।

সে বললে, 'বুড়ী আপনাকেও রেহাই দিল না!'

আমি কি উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই বার মেড আবার বললে, 'আপনি আসার আগে আর একটি লোককে ধরেছিল বিয়ার খাওয়াবার জন্যে। তার কাছেও কি সব বলছিল আর কাঁদছিল।'

'আর একজনের কাছেও সে দুঃখের কথা বলছিল, আর কাঁদছিল?'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম। তাই না জনি?'

তার পাশে উপবিষ্ট লোকটি বললে, "হ্যাঁ স্যার। এ রকম অনেক বুড়ী আছে, যাদের পয়সা দিয়ে মদ কিনে খাবার অবস্থা নেই, তারা কখনো কখনো এ রকমভাবে একা এসে বসে থাকে, আর কাউকে ধরে দুঃখের কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, তার সহানুভূতি কুড়োয়, তার পয়সায় মদ খায়।'

কেমন করে ওদের বলবো যে যাকে ওরা বৃদ্ধা বলে মনে করেছিল, সে বৃদ্ধা নয় আসলে!

কিন্তু কেন তার ছদ্মবেশের প্রয়োজন হয়েছিল? কিসের জন্যে এই ছলনা? সবটাই কি তার মিথ্যে! সে কি সত্যিই দরিদ্র? সে যুবতী বলে কি পাছে তার মদ খেতে চাওয়ার পরিবর্তে কেউ তার কাছে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে পারে—এই আশংকাতেই কি তার বৃদ্ধার ছদ্মবেশ! সহানুভূতি কুড়োনোর জন্যে নিপুণ অভিনয়! মিথ্যার বেসাতি!

আর যেন ভাবতে পারছিলাম না। এই বন্ধ ঘরের ধোঁয়াচ্ছন্ন বাতাস যেন সমস্ত স্নায়ুকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে, মনে হচ্ছে বিয়ার খাওয়ার জন্যেই হয় তো মাথার মধ্যে এমন ঝিম ঝিম করছে, আগুনের মতো জ্বলছে চোখ দুটি।

আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম পাব্ থেকে। যে করেই হোক তাকে ধরতে হবে। এ ভাবে যে সে আমাকে বোকা বানিয়ে চলে যাবে এ-কথা ভাবতে পারছিলাম না।

বাইরে জমাট কুয়াশা। তবু তারই মধ্যে যতদূর সম্ভব দেখবার চেষ্টা করলাম। কান খাড়া করে শুনতে পেলাম খট্ খট্ করে জুতো পায়ে পথচারিদের চলার আওয়াজ! এই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সে নিশ্চয়ই বেশী এগোতে পারেনি। সেই পদশব্দ অনুসরণ করে যথাসাধ্য জোরে এগিয়ে চললাম।

খানিক পথ এগোতেই দেখতে পেলাম সামনেই হাঁটছে একটি মূর্তি। ওভারকোটে শরীর ঢাকা, মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। আরো একটু দ্রুত পদে এগিয়ে গেলাম সেই মূর্তির কাছে।

আমার পদ শব্দ সে শুনে থাকবে। তাই সে মূর্তি থমকে দাঁড়াল। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। সেই ওভারকোট, সেই স্কার্ফ। যা দেখেছিলাম, পাব এর সেই বৃদ্ধার পরনে।

তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাতেই সে বললে, 'আমি জানতাম, তুমি আমায় অনুসরণ করবে।'

আমি কঠোর স্বরে বললাম, 'তুমিই সেই অভিনেত্রী না, যে একটু আগে ঐ বারে বৃদ্ধার অভিনয় করলে?'

'আস্তে। অত চেঁচিও না। যদি কিছু জানতে চাও তো আমার সঙ্গে এস। আমি সব বলবো তোমাকে—কেন এই অভিনয়! কেন এই প্রতারণা!'

আমি নিজেকে সংযত করে বললাম, 'চল।'

আমি নীরবে খানিকটা পথ তার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

শেষে একটি পথের মোড় পেরিয়ে একটি রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে সে থামল। বললে, 'সামনেই আমার বাড়ী।'

সে পকেট থেকে চাবি বার করে বাড়ীর সদর দরজা খুলল। সামনেই সরু প্যাসেজ। অন্ধকার। সে বললে, 'দাঁড়াও।' তারপর ভিতরে ঢুকে গেল। মুহূর্ত পরে আলোকিত হল সেই প্যাসেজটি। সে বললে, 'এস।'

তার চাল চলনে আগাগোড়াই রহস্যের স্বাদ পাচ্ছিলাম। এই প্রচণ্ড কুয়াশার মতো ঘন রহস্যময় এক নারী!

ভিতরে ঢুকলাম। সে একটি ঘরের দরজা খুলল, বললে, 'এই আমার ঘর।'

ঘরে আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় চোখ পড়ল একটি খাট—সেই খাটে শায়িত রয়েছে একজন।

থমকে গেলাম।

খাটের ওপর কম্বলে গলা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল একটি বৃদ্ধ। পক্ক কেশ, লোল চর্ম। শুধু চোখ দু'টি জ্বলছে।

আমার সঙ্গিনী বললে, 'আমার প্রকৃত নাম আনেৎ! আর এই যে বৃদ্ধকে দেখছ—ও আমার স্বামী।' এক মুহূর্ত থেমে সে বললে, 'অবশ্য সামাজিক অর্থে নয়। ব্যবহারিক অর্থে।'

আমি অবাক হয়ে আনেৎ-এর মুখের দিকে তাকালাম। সে ঘরে ঢুকে স্কার্ফ ওভারকোট খুলে ফেলেছিল। আলোয় দেখলাম আমার পাশে দাঁড়িয়ে যৌবন-দীপ্ত এক নারী!

তার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, আমাকে সেই ভাবে তাকাতে দেখে সে হেসে বললে, 'কি দেখছ অমন করে?'

বললাম, 'এ রকম রূপসী অন্তত পথে ঘাটে নিত্য দেখা যায় না—এ কথা হলফ করে বলতে পারি।'

সে হাসল, বললে, 'আমার স্বামীর নাম মিঃ রিচার্ড ডেভিস। একদিন ও ছিল এ দেশের খ্যাতনামা নাট্যকারদের অন্যতম। ওর অনেক নাটক সাফল্যের সঙ্গে শত শত রাত্রি অভিনীত হয়েছে।"

আমি মিঃ ডেভিসের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ওঁর নামটা আমার শোনা ছিল। তবে কোনো নাটক দেখিনি বা পড়িনি। আপনার সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম মিঃ ডেভিস। বোধ হয় নাট্যকারের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে এক নাটকীয় পরিবেশের প্রয়োজন ছিল!'

আমার কথায় হেসে উঠল আনেৎ। মিঃ ডেভিসও হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

আনেৎ বললে, 'তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে না নিশ্চয়ই যে আমিও একদিন অভিনেত্রী ছিলাম। অন্তত কিছুক্ষণ আগে পাব্-এ আমার অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় তুমি পেয়েছ!'

আমি তার কথায় হাসলাম, বললাম, 'কিন্তু পুরোপুরি ব্যাপারটা এত বেশী নাটকীয় যে আমার পক্ষে হজম করা শক্ত হচ্ছে! কেনই বা তোমার এই ছদ্মবেশ আর অভিনয়?'

আনেৎ বললে, 'সেই কথা বলবো বলেই তো তোমাকে আসতে বললাম সঙ্গে। কিন্তু তার আগে এক কাপ কফি খাও।'

আমি মিঃ ডেভিসের দিকে চেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, আনেৎ

বলে উঠল, 'ও কানে শুনতে পায় না! কথাও বলতে পারে না! আর ঐ যে জ্বলন্ত চোখ দু'টি দেখছ—ও দু'টো পাথরের!'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কায় নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হয়ে পড়ছিল আমার পক্ষে! আমি অবাক হয়ে একবার আনেৎ-এর দিকে তাকালাম, একবার তাকালাম মিঃ ডেভিসের দিকে। এ কি সত্য! যা দেখছি, যা শুনছি এ কি স্বপ্ন নয়! আমার মনের কল্পনা নয়! বিভ্রম নয়!

আনেৎ-এর কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। ঘরের কোণে রাখা গ্যাসের স্টোভে সে কফি তৈরীর জন্যে কেটলী বসিয়ে দিতে দিতে বললে, 'সব বুঝি ধোঁয়া মনে হচ্ছে?"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

আনেৎ কফির কাপ সামনের টেবিলে সাজাতে সাজাতে বললে, 'রিচার্ড যখন খ্যাতির উচ্চ চূড়োয় তখন তার একটি নাটক প্যারিসের একটি রঙ্গালয়ে অভিনীত হচ্ছিল। আমি তখন সোবর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসা সাহিত্যের ছাত্রা। সেই নাটক দেখতে গিয়ে পরিচয় হয় ওর সঙ্গে। ওর তখন বয়স পঞ্চাশ, আমার একুশ। তারপর ঘনিষ্ঠতা, পরে ওর একটি নাটকে আমি নামলাম নায়িকার চরিত্রে। লেখাপড়া সব মাথায় উঠল। শুধু তাই নয়, বাড়ী ঘর বন্ধু বান্ধব, চির পরিচিত পরিবেশ সব ছাড়লাম ওর জন্যে।'

সে কেটলীটা নিয়ে এল স্টোভের ওপর থেকে, তারপর কফি ঢালতে ঢালতে বললে, 'সেটা যুদ্ধের গোড়ার দিকের ঘটনা। তারপর যুদ্ধ ঘোরাল হল। প্যারিসের হল পতন। রিচার্ড তখন সামরিক বিভাগে চাকরী করতো। যুদ্ধের মধ্যে এক প্রচণ্ড বোমারু আক্রমণের সময়ে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তার বাক্ ও শ্রবণ-শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। আর বোমার স্প্লীণ্টার চোখের মধ্যে ঢুকে চোখ দুটিকে চিরজীবনের জন্যে দিল শেষ করে।'

কফির কাপটা সে কথা বলতে বলতে এগিয়ে দিয়েছিল আমার দিকে। আমি সেটি হাতে নিয়েই শুনছিলাম তার ইতিবৃত্ত।

সে থামতে আমি বললাম, 'তারপর ?'

'তারপর !' সে নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বললে, 'তারপর যুদ্ধ শেষ হতে আমরা চলে এলাম ইংলণ্ডে। বাক্ শ্রবণ আর দৃষ্টি শক্তি সব এক সঙ্গে হারিয়ে রিচার্ড আজ অথব, অকেজো অক্ষম। শিশুর চেয়েও অসহায় !'

সে তাকাল রিচার্ডের দিকে। সে দৃষ্টিতে যেন রিচার্ডের প্রতি তার সুগভীর প্রেম উছলে পড়ল ! রিচার্ড যে সব দিয়েছে তারই জন্যে !

সে বললে, 'শুনলে তো সব ?'

'সব কোথায় শুনলাম ? তোমার কথা তো বলনি এখনো!'

'আমার কথা ?'

'হ্যাঁ, তোমার কথা ! প্যারিসের রঙ্গালয়ের একদা সেই অপরূপ রূপসী নায়িকা অভিনেত্রীর কি হল ?'

'যুদ্ধের সময়ে যে নায়িকা ছিল একুশ বছরের, আজ সে আঠাশ বছরের যুবতী। শুধু দেহে, মনে সে রিচার্ডের সমবয়সী প্রৌঢ়া ! তাই তো এই ছদ্মবেশ !'

বললাম, 'ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘুরে বেড়াও কেন ? নিজের রূপ যৌবন ঢেকে কেন মানুষকে ঠকাও ? মিথ্যে কথায় ভোলাও ?'

'মানুষকে ঠকাই ? ভোলাই ?' আনেৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ঠকাই নিজেকে !' নিজেকে ভোলাই !'

সে চুপ করে উঠে গেল রিচার্ডের কাছে। তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বলল, তারপর উঠে বসল চেয়ারে, বললে, 'বুঝলে মিঃ সেন, রূপ যৌবনের বড় জ্বালা ! তুমি পুরুষ, বুঝবে না আমার কথা। প্রত্যেক নারীই বোঝে তার যৌবনের জ্বালা কী। আর যদি যৌবনের সঙ্গে তার রূপ থাকে—তবে সে জ্বালা শতগুণ বাড়ে !'

আমি কোনো কথা বললাম না। সে বলে চলল, 'প্রথম প্রথম এখানে স্বাভাবিক ভাবেই চলতাম। এই রূপ যৌবন, আমার চলাফেরা ওঠা বসা পুরুষের চোখে বড় বেশী প্রকট হয়ে উঠল। বিশেষ, যখন আমার আলাপীরা দেখল আমার ঘরে একটি অথর্ব চলৎ—শক্তিহীন বৃদ্ধ! অনেক প্রলোভন, যৌবন উপভোগের অনেক হাতছানি, অনেক অর্থরাশি এসে উপচে পড়ল আমার চারপাশে। অল্প দিনেই এত শুভাকাঙ্খী হিতৈষী বন্ধু এসে জুটল যে নিজেকে স্থির রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। এক সময়ে মনে হল ভোগের চরম লগ্ন এসে বুঝি উপস্থিত হয়েছে জীবনে! বোধ হয় সেই লগ্নে নিজেকে হারিয়েও ফেলতাম, মুক্ত করে ফেলতাম এই অথর্ব লোলচর্ম বৃদ্ধের অক্ষম বন্দী দশা থেকে!'

সে থামল, আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'একদিন রাত্রে রিচার্ডকে চিরদিনের মতো ছেড়ে এক বিরাট ধনী যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা ছোট্ট সুটকেশে আমার পোশাক আর দু'একটি জিনিস ভরে রেখেছিলাম। রিচার্ডকে কিছুই জানতে দিইনি। ঠিক ছিল ও ঘুমিয়ে পড়লে বেরোবো।'

একটুখানি থেমে আনেৎ বললে, 'একটু রাতে ওকে যখন ঘুমন্ত দেখলাম, তখন আমি বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী হয়ে নিলাম। সুটকেশটা খুলে আর একবার দেখতে গিয়ে দেখি তার মধ্যে রাখা আমার একমাত্র ফটো যা একদিন রিচার্ড নিজে তুলেছিল প্যারিসে—সেটা নেই। অবাক হয়ে সুটকেশটা ভাল করে দেখলাম। ঘরের মধ্যে কোথাও দেখতে পেলাম না ফটোটা। হঠাৎ একটা সন্দেহ হল। রিচার্ড যে কম্বল ঢেকে শুয়েছিল, সেই কম্বল তার গলা থেকে সরাতেই দেখলাম দু'হাত দিয়ে আমার সেই ফটোটা বুকের ওপর আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছে রিচার্ড। তার সেই পাথরের চোখ দুটির কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা!'

আনেৎ-এর গলা রুদ্ধ হয়ে এল আবেগে। খানিকক্ষণ সে চুপ

করে রইল। তারপর খাটের ওপর গিয়ে বসল সে রিচার্ডের বুকের ওপর মাথা রেখে।

তার সারা শরীর দুলতে লাগল। অজস্র কান্নায় ভেঙে পড়ল আনেৎ।

শীতের নিথর নিঃশব্দ বোবা রাত্রির প্রহরগুলি অতিক্রান্ত হয়ে চলল! ঘরে সেন্ট্রাল হিটিংএর ব্যবস্থা নেই; ফায়ার প্লেসে নেই আগুন, মৃত্যুর মতো শীতল ঘরখানি। উত্তাপ নেই কোথাও, উত্তাপ যা কিছু সব ঐ দুটি অসম-বয়সা নর নারীর অন্তরে! একজন সব ইন্দ্রিয়-বোধের অতীত, অন্যজন ইন্দ্রিয়-রোধে তপস্বিনী!

কোনো কথা বলতে পারলাম না! মনে হল, এই মুহূর্তে জীবনের রঙ্গমঞ্চে, একটি নাটক অভিনীত হল—সে নাটকের একটি অদৃশ্য নাট্যকার, দুটি চরিত্র ও একটি মাত্র দর্শক।

স্প্যানিশ প্রাইমা ব্যালেরিনা

মাদ্রিদ থেকে স্পেনের এক বিখ্যাত ব্যালে গ্রুপ লণ্ডনে এসেছে। লণ্ডনের সংস্কৃতিসম্পন্ন নরনারী সেই দলের নাচ দেখার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাদের 'সোয়ান লেক' নৃত্যানুষ্ঠানটি প্যারিসে দেখিয়ে তারা মাতিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ানদের জগৎবিখ্যাত 'সোয়ান লেক' নাচের সঙ্গে তুলনীয় সে অনুষ্ঠানটি।

তাদের প্রাইমা ব্যালেরিনার নাম মারিয়ানে সাসেজ মেজিয়াস। স্পেনের শ্রেষ্ঠ রূপসী নৃত্যশিল্পী যে তার মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে মন কেড়ে নিয়েছে স্পেন ও ফ্রান্সের বহু ধনকুবেরদের, বরণীয় শিল্পী কবি ও সাহিত্যিকদের। তাকে মঞ্চে দেখার জন্যে দর্শকরা টাকার হিসাব করে না। তাকে মঞ্চের বাইরে পথে ঘাটে কোথাও দৈবাৎ দেখলে ভিড় জমে যায়।

লণ্ডনে দলটি আসার অনেক আগেই প্রচার ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। অলড্‌গেটে 'স্ট্রান থিয়েটারের মঞ্চে একুশ দিন তারা ব্যালে দেখাবে। বিজ্ঞাপন বেরোবা সঙ্গে সঙ্গে সব কটা দিনের সমস্ত টিকিট আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে আমি ক'বার গিয়েও টিকিট পেলাম না।

লণ্ডনে রাসেল স্কোয়ায়ের কাছে মার্চমাণ্ড ষ্ট্রীটে 'লিলির কেবিন' রেস্তোরাঁর নাম তা নয়, মালিক একজন ইংরেজ—লিলি তার মেয়ে কুড়ি একুশ বছরের তন্বী সুশ্রী লিলি ও তার বাবা কেবিনের কা করে, মা কিচেনে রান্না করে একজন মেয়ে নিয়ে।

রাসেল স্কোয়ার, ট্যাভিস্টক স্কোয়ার, ব্লুম্‌স্‌বেরি স্কোয়ার এলাকা গুলিতে অনেক ভারতীয় ছাত্রের বাস, আফ্রিকানও আছে। তাছাড়

গাওয়ার স্ট্রীটেও অনেক ভারতীয় ছাত্রের বাস, আফ্রিকানও আছে। ভারতীয় হাই কমিশন 'ইণ্ডিয়া হাউস'ও অল্‌ড্‌গেটের কাছেই। এই সব ছাত্র ছাড়া অন্যেরাও কেবিনে আসে। সেজন্যে লিলির দোকানে খাবার জন্যে সব সময়ে ভিড় থাকে। ভিড়ের কারণ অবশ্যই লিলি।

তাই বলে লিলি রেস্তোরাঁর সস্তা মেড নয়। সবার প্রতি সৌজন্য-মূলক ব্যবস্থা সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখে। প্রত্যেকেই মনে করে তার প্রতিই বুঝি লিলির ঝোঁক। এই রেস্তোরাঁর ভারতীয় খদ্দেরদের মধ্যে কলকাতার বেশ কয়েকটি নামা অভিজাত পরিবারের ছেলেরাও আসে, তাদের অনেকে আবার ব্যারিস্টারি পড়ছে।

রাসেল স্কোয়ার থেকে অল্‌ড্‌গেটে 'স্ট্রোল থিয়েটার' বেশি দূরে নয়, হেঁটেই যাতায়াত চলে। রাসেল স্কোয়ারের চারিদিকে অনেক ছোট বড় হোটেল, বেড এণ্ড ব্রকফাস্ট সার্ভিস। দু'বেলার খাওয়া বাইরে। আমি তখন রাসেল স্কোয়ার টিউব স্টেশনের উল্টো দিকে বার্নার্ড স্ট্রিটের এক হোটেলে থাকি। আমার হোটেলের কাছেব এক হোটেলে এসে উঠল স্প্যানিশ ব্যালে দল, তাদের অনুষ্ঠান-কেন্দ্র কাছে হবে বলে ইম্প্রেসারিও বোধহয় এই ব্যবস্থা করেছিল।

সেদিন ইভনিং ক্লাশ সেরে যখন রাসেল স্কোয়ারে লিলির কেবিনে এলাম রাতের খাবারের জন্যে, তখন রাত মন্দ হয়নি, দুএকটি ইংরেজ বসে হাই-টি খাচ্ছিল। আমি ঘরে ঢুকে লিলিকে খাবার অর্ডার দিলাম। তারপর সেদিনের সন্ধ্যে বেলার ইভনিং স্টার মেলে ধরলাম চোখের সামনে।

এমন সময়ে হুড়মুড় করে ঢুকল একদল ছেলেমেয়ে। তাদের সাদাটে ধরনের ফর্সা রং, অনতিদীর্ঘ উচ্চতা, কালো ভুরু ও কালো চোখ দেখে বুঝতে দেরি হল না যে তারাই সেই নবাগত স্প্যানিস ব্যালের অন্তর্ভুক্ত।

তাদের দলপতি একজন প্রৌঢ়, সে লিলির বাবার সঙ্গে ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে কথা বলল, খানিকক্ষণ কথা বলার পর দলপতি তার

দলের লোকদের কি সব বোঝাল। শেষ সকলে ফাঁকা চেয়ার-গুলোতে বসে পড়ল। সকলের জন্যে আলাদা চেয়ার না হওয়ায় একটা চেয়ারেই দু'জন করে বসল।

আমার টেবিলে দলপতি বসল, তার দুপাশে দুটি মেয়ে, আমার বিপরীত দিকে অন্য দুটি চেয়ারে বসল দুটি ছেলে। শুধু স্থানাভাব নয়, এই রাতে খাদ্যাভাবও হবার কথা। তাই দেখলাম লিলির বাবা মা এবং লিলিও আস্তিন গুটিয়ে কিচেনে স্টকের পাউরুটি ডিম স্টেক হ্যাম বার করে রান্না শুরু করে দিল। এতগুলি অপ্রত্যাশিত খদ্দেরকে কেউ ফেরায়? তাই কয়েক মুহূর্তেই কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল রেস্তোরাঁয়।

আমি ইভনিং স্টার হাতে নিয়ে চোখ বুলোচ্ছিলাম আর আড়-চোখে মাঝে মাঝে দেখছিলাম দলের লোকদের। ছেলে মেয়েরা সুশ্রী, সকলেরই সুগঠিত দেহ। ব্যালে নাচিয়েদের পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ সৌষ্ঠব।

আমার কাগজের পিছন দিকের পাতায় ওদের কথা ছাপা হয়েছিল, ছবিও ছিল প্রাইমা ব্যালেরিনা মারিয়ানের ও নায়ক রুডল্‌ফোর। সেই দিকে দেখছিল আমার সামনে বসা দলপতি ও তার সঙ্গীরা। দলপতির সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হতে সে বললে, "এক্‌স্‌কুজ মি, এই কাগজে আমাদের দলের কথা লিখেছে দেখছি। কি লিখেছে বলবেন একটু দয়া করে?"

তারা যে স্প্যানিশ ব্যালে দলের সে কথা বলার প্রয়োজন হয়নি বলেই দলপতি বিনা ভূমিকায় বললে কথাটা।

আমি বললাম, "ইংরেজি পড়তে জানো?"

"কিছু কিছু।" দলপতি বললে।

তার হাতে কাগজটা দিয়ে বললাম, "আমার পড়া হয়ে গেছে। তুমি নিতে পারো।"

দলপতি 'থ্যাঙ্কু' বলে কাগজখানা ভাঁজ করে সামনে মেলতেই সব

চেয়ার খালি করে সকলে উঠে এসে দলপতির পিছনে ঝাঁক বেঁধে ঝুঁকে পড়ল। কেউ কেউ বললে, "মারিয়ানে! মারিয়ানে! রুডল্‌ফো!"

আমি মেয়েদের দিকে তাকালাম। মারিয়ানে কি আছে এদের মধ্যে? না থাকাই সম্ভব। সে দলের স্টার-ডান্সার। নায়কও নিশ্চয়ই নেই। তারা মনে হয় দলবলের সঙ্গে ঘুরবে না, সস্তা দামের হোটেলে এসে খাবে না। তাদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের জন্যে বড় বড় লোক আছে, বিরাট হোটেল রেস্তোরাঁ আছে লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ড পাড়ায়।

আমি দলপতিকে বললাম, "তোমাদের দলের কথা অনেক লিখেছে! মারিয়ানে একজন প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী, গুণী, শিক্ষিতা, খুব ভাল ইংরেজি জানে। স্পেনের এক অভিজাত ঘরের মেয়ে। সাত বছর বয়স থেকে ব্যালেতে আছে!"

দলপতি মাথা নেড়ে বললে, "হ্যাঁ, মারিয়ানে সত্যিকার বড় শিল্পী!"

বললাম, "তোমাদের অনুষ্ঠান শুরু পরশু থেকে, তাই না?"

"হ্যাঁ।" তারপর বললে, "তুমি দেখতে যাচ্ছ?"

আমি হাসলাম, "দুর্ভাগ্য, টিকিট পাইনি। নো লাক। দুটো আঙুল কপালে ঠুকে বললাম। ওরা সকলে হেসে উঠল।

বললাম, "তোমাদের 'সোয়ান লেক' দেখার ইচ্ছে ছিল। রাশিয়ান ব্যালের নাচ দেখেছি। সে অপূর্ব নাচ।"

দলপতি কৌতূহলী হয়ে বললে, "হাঁ, কার ব্যালে দেখেছ?"

আমি বললাম, "অরিজিনাল ব্যালে রুসি'র প্রোডাকসান। লণ্ডনে দেখেছি অবশ্য। এখানে কাছেই 'এডেলফি থিয়েটারে' ওদের অনুষ্ঠান তিন সপ্তাহ ধরে চলেছিল। সোয়ান লেকে রাণী করেছিল নীনা…নীনা স্ত্রোগানোভা। রাজপুত্রের নাম মনে নেই। সাবলাইম চাইকোভস্কির ম্যাজিক!"

"রাশিয়ানদের ব্যালে তো পৃথিবী বিখ্যাত!" দলপতি বললে।

অন্যেরা ইংরেজি জানে না, তারা কিছু বুঝতে পারছিল না, তাই দলপতি তাদের বুঝিয়ে দিল আমাদের কথাবার্তা স্প্যানিশ ভাষায়। তারা সকলে বেশ আগ্রহের সঙ্গে আমাকে দেখতে লাগল।

বললাম, "তোমাদের মারিয়ানে এদের মধ্যে নেই ?"

"না। ও গেছে অন্য জায়গায়। প্রেস কনফারেন্স, ইন্টারভিউ, বি বি সির প্রোগ্রাম—ভীষণ ব্যস্ত ! ওর সঙ্গে আমাদের নায়কও গেছে, আর ডান্স ডিরেকটার, ম্যাজিক ডিরেকটার সকলে গেছে।"

একটু থেমে বললাম, "দুঃখ হচ্ছে যে তোমাদের সঙ্গে আলাপ হল অথচ তোমাদের নাচ দেখা হবে না।"

দলপতি বললে, "তুমি ভারতীয় ছাত্র ?"

"ভারতীয় ছাত্রই ! একজন লেখকও বটে, কয়েকটি বই ছাপা হয়েছে।"

"আচ্ছা ! তাহলে এক কাজ কর না। তুমি কাল আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করো—আমি তাকে বলে দেখি। তবে কোনো আশা দিচ্ছি না।"

বললাম, "ধন্যবাদ। দেখা করবো, একবার চান্স নেবো তাহলে।"

দলপতি বললে, "ভারতীয়দের সম্বন্ধে মারিয়ানের খুব আগ্রহ।"

"কি রকম ? বিশেষ কারণ আছে কিছু ?"

"ওর পরিবারের পূর্ব পুরুষ তোমাদের দেশে এককালে ছিলেন। আরো কি যেন ব্যাপার। আমি ঠিক জানি না, তবে ভারতীয় নাচ সম্বন্ধে ও খুব উৎসাহী। এ বিষয়ে তুমি কিছু সাহায্য করতে পারো ?"

"আমি ?" হেসে ফেললাম, "না, আমি নাচের ব্যাপারে কিছু জানি না, তবে দেখতে ভালবাসি। তাছাড়া ভারতীয় নাচ বিরাট শাস্ত্র। সে খুব কঠিন বিষয়।"

"শুনেছি। মারিয়ানেও সেই কথা বলে। ওকে এ ব্যাপারে যদি কোনো খবরাখবর দিতে পারো তাহলে ওর সঙ্গে তোমার একবার দেখা

করিয়ে দিতে পারি। তবে ও এত ব্যস্ত যে সময় দিতে পারবে কি না জানি না।"

বললাম, "তার সঙ্গে পরিচয় হলে খুশিই হবো। ভারতীয় নাচ সম্বন্ধে যা দু'চার কথা জানি, বলতে পারবো।"

"বেশ তো, কাল বিকেলে এসো আমাদের হোটেলে। কোথায় উঠেছি জানো?"

হেসে বললাম, "জানি। আমার হোটেল তোমাদের কাছেই। মারিয়ানেও কি ঐখানে আছে?"

"হ্যাঁ, পুরো হোটেল আমরা নিয়েছি একুশ দিনের জন্যে।"

ইতিমধ্যে খাবার প্রস্তুত হয়ে গেছিল, লিলি প্লেটগুলি এনে টেবিলে রাখতে লাগল।

পরদিন সন্ধ্যার সময়ে তাদের হোটেলে গিয়ে দলপতির খোঁজ করলাম। আগের দিন তার নাম জেনে নিয়েছিলাম। সিনর জুলিও। আমার নাম ও পরিচয়ও সে লিখে নিয়েছিল একটা কাগজে মারিয়ানেকে দেখাবে বলে।

জুলিও আমাকে দেখে বললে, "মারিয়ানে সারা দুপুর স্টেজে রিহার্সাল দিচ্ছে, এখনো ফেরেনি। একটু বাদে ফিরবে।"

বললাম, "তাহলে ঘুরে আসছি। এক ঘণ্টা পরে আবার আসবো।"

"একঘণ্টা নয়, দু'ঘণ্টা বাদে এসো। এসে সে বিশ্রাম করবে। তাকে আমি তোমার কথা বলেছি। সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। ভারতবর্ষের নাচের উপরে কোনো বই-এর বিষয়ে জানতে চায়।"

বললাম, "ঠিক আছে, আমি আটটার সময়ে আসবো আবার। কিন্তু তখন তো তোমরা সকলে খেতে যাবে?'

"না, আমরা এখন থেকে এই হোটেলেই খাবার ব্যবস্থা করেছি। মারিয়ানেও কোথাও যাবে না। আজ সন্ধ্যে বেলায় ও ফ্রী। কাল সকাল থেকে ওর প্রোগ্রাম ঠাসা।"

আমি জুলিওকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলাম। য়ুরোপের একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করার সুযোগ হবে বলে খুশি হলাম।

ঠিক আটটায় সেই হোটেলে গিয়ে দেখি সামনের লাউঞ্জে সিনর জুলিও বসে আছে কয়েকজনের সঙ্গে। আমাকে দেখে উঠে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, বললে, "মারিয়ানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। চল, ওপরে যাই।"

তার সঙ্গে দোতলায় উঠলাম। সামনের ঘরের দরজায় সিনর জুলিও টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল আমাকে ইসারায় একটু অপেক্ষা করতে বলে।

এক মিনিট পরে বেরিয়ে বললে, "তুমি ভিতরে যাও।"

"তুমি আসবে না সঙ্গে? পরিচয় করিয়ে দেবে না?"

"ও সব জানে। ওকে বলেছি তুমি একজন ভারতীয় বড় লেখক। ও খুব আগ্রহী হয়েছে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে!"

আমি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। সিনর জুলিও নীচে নেমে গেল।

সুন্দর বহু মূল্যবাম আসবাব পত্রে সুশোভিত মাঝারি আকারের ঘর। দরজা জানলায় পেলমেট ও মোটা পর্দা, মেঝেয় পুরু কার্পেট। ঘরে নীলাভ আলো, এক পাশে ডানলোপিলো খাট, তার পাশে রাখা এক গোল টেবিলে নিভানো ছোট টেবিল ল্যাম্প, সামনে একটা বই, ফ্লাওয়ার ভাসে কারনেশন ও অর্কিডের গুচ্ছ। দেওয়ালে কর্ণওয়ালের ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি, ম্যান্টলপিসের ওপরে ঝোলানো বিরাট বেলজিয়ান আয়না, মাঝখানে একটা টেবিলের দু'দিকে সোফা সেটি। সেন্ট্রাল হিটিংএ আরামপ্রদ ঘর।

"গুড ইভনিং মিঃ সেন।"

"গুড ইভনিং" বলে তাকালাম বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরের অধিকারিনীর দিকে। খাটের ওপরে পাশ বালিশে হেলান দিয়ে

মারিয়ানে বসে ছিল। পরনে লাল রঙের ম্যাক্সি। ঘন কালো দীর্ঘ চুলের গোছা পিছনে ঝুলছে, টানা সরু ভুরু ও কালো দু'টি আয়ত চোখ ও মনি। ফর্সা বাঁ গালের নীচে একটা কালো তিল। সুগঠনা, তন্বা, কাঁধ ও বুকের কাছে অনেকটা অনাবৃত। তারই ফাঁকে উন্মুক্ত তার সুডৌল স্তনের ঊর্ধভাগ ও মধ্যেকার খাঁজ। হেলানোভাবে বসে থাকার জন্যে আঁটো সাঁটো আবরণ নিটোল নিতম্বের সঙ্গে চেপে আছে। নিখুঁৎ রূপসী ; ভেনাসের ভাস্কর্য যেন ; যেন ভ্যান গগ-এর আঁকা ছবি !

স্থান কাল পাত্র ভুলে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তার স্বাগত ভাষণের উত্তরে কিছু বলতে পারছিলাম না। এমনই সম্মোহিনী রূপের অধিকারিনী সে !

আমার বিমুগ্ধ অবস্থাটা সে বোধহয় উপলব্ধি করল, মৃদু কণ্ঠে বললে, "প্লাজ, বস মিঃ সেন।"

সোফার ওপরে বসতে যাচ্ছিলাম, সে খাটের পাশে রাখা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "এখানে বস। সারাদিন রিহার্সাল দিয়ে আমি পরিশ্রান্ত, সেজন্যে উঠে বসতে পারছি না। খাটেই একটু হেলান দিয়ে শুয়েছি। উড য়ু মাইণ্ড ?"

"নিশ্চয়ই নয়। তুমি আরাম কর। এ সময়ে তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যে আমি দুঃখিত।"

আমি চেয়ারে বসলাম তার মুখোমুখি।

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাল সে। তারপর বললে, "ভারতবর্ষের কোন প্রান্তে থাকো তুমি ?"

"কলকাতায়।"

"হ্যাঁ, কালকুটা! জানি, বেঙ্গল-এ। তাই না? তুমি বাঙালি ?"

এত খবর রাখে মারিয়ানে! বিস্মিত হয়ে বললাম, "মনে হচ্ছে আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু খবর রাখ !"

"তুমি যা ভাবছো তার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখি মিঃ সেন !

আমার ঠাকুর্দার বাবা ও তাঁর কাকা অনেকদিন তোমাদের দেশে কাটিয়েছিলেন, তারপর দেশে ফিরে আসেন। ঠাকুর্দার কাছে বাবার কাছে তোমাদের দেশের তখনকার কালের অনেক কাহিনী শুনেছি। তাঁরা কিছু নিদর্শনও এনেছিলেন সঙ্গে করে! আজো সেগুলি আমাদের বাড়িতে সযত্নে রাখা আছে।"

আমি বিস্মিত হয়ে শুনছিলাম তার কথা। এ যে বেশ কয়েক পুরুষের সম্পর্ক তাদের আমার দেশের সঙ্গে! খুশি হলাম।

বাংলা দেশে ইংরেজরা আসার অনেক আগে পোর্টুগীজ ও স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুরা সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগর ধরে সুন্দরবনের নদ নদী দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকতো। কেউ কেউ দস্যুবৃত্তি করতো, কেউ বা তখনকার রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা কেদার রায় প্রভৃতি বারো ভূঁইয়াদের হয়ে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো, চাকরী করতো সৈন্য বিভাগে! এ সব আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে আছে।

রোমাঞ্চ জাগল। মনে হল আমাদের বহুকাল পূর্বে বিস্মৃত অতীতের গর্ভে বিলীন ইতিহাসের ছেড়া পাতা যেন তুলে ধরল মারিয়ানে আমার সামনে!

মারিয়ানে বললে, "আমাদের দেশের বহু জিপসীর মাতৃভূমিও ভারতবর্ষ। তোমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহু যুগের!"

হেসে বললাম, "কলম্বাস ভাসকো ডা গামার সময় থেকে! পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা!"

"ঠিক তাই।" মারিয়ানে একটু থেমে বললে, "স্পেনে গেছো?"

"না। তোমাদের দেশের অবস্থা রাজনৈতিক কারণে নিরাপদ নয়। ওখানে আমাদের কোনো এমবেসি নেই। নিরাপত্তার অভাব।"

'সে কথা সত্যি। অনেক কালের অন্তর্বিদ্রোহের দরুন ওখানে অনেকে যেতে সাহস পায় না।" তারপর বললে, "এখানে কতদিন আছ? কি কর? লিখছো কিছু?"

খোলাখুলি প্রশ্ন ও কৌতূহল। নিজের কথা সংক্ষেপে বললাম।

সে আগ্রহ নিয়ে শুনল।

তারপর বললাম, 'তোমাদের সিনর জুলিও বললে তুমি নাকি ভারতীয় নাচ সম্বন্ধে আগ্রহী ?"

"হ্যাঁ, সেজন্যেই তো তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে জাগল। তুমি লেখক, কিছু খবর অন্তত দিতে পারবে !"

"লেখক হলেও নাচের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। আমাদের নাট্য শাস্ত্র বিশাল, কঠিন বিষয়।"

সে বললে, "প্যারিসে ও এখানে এসে ভারতীয় চিত্রকলা ও সংস্কৃতির উপরে কয়েকটা বই কিনেছি, সঙ্গীতের উপরেও। কিন্তু নাচের উপরে পাইনি। ভারতীয় নৃত্যকলা একটু চর্চা করার শখ ছিল !"

"ভারতবর্ষের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ দেখে খুব খুশি হলাম। তবে ভারতীয় নাচের কোনো বই এখানে আছে কি না জানি না সিনরিটা সাঁসেজ মোজিয়াস !"

"বাপ্‌স্‌! অত বড় নয়, ছোট করে বল মারিয়ানে। উচ্চারণ করা সহজ হবে !" সে হাসল।

"তোমার নামটা খুব সুন্দর, তোমার চেহারারই উপযুক্ত !" বলেই মনে হল প্রগল্‌ভ হয়ে অশোভন কথা বলে ফেলেছি হঠাৎ !

সে কিন্তু হাসল একটু, বললে, "আমাদের অনুষ্ঠান দেখছো ?"

"সুযোগ হল না। অনেক আগেই সব টিকিট শেষ। আমি পাইনি।"

সে একটু হেসে বললে, "আচ্ছা !" কয়েক মুহূর্ত থেমে বললে, "ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে কিছু জানো ?"

"কিছুই জানি না দু'একটা সাধারণ কথা ছাড়া। এ নাচের অনেক রূপ ও আঙ্গিক। ধ্রুপদী নাচ সারা ভারতে চর্চা হয় ! যেমন দক্ষিণ ভারতে কথাকলি কুচিপুডী, ভরত নাট্যম, উত্তর ভারতে কত্থক, পূর্ব ভারতে মনিপুরী ওড়িসি। এ ছাড়াও আছে অনেক আঞ্চলিক নাচ,

লোকনৃত্য সংস্কৃতির এলাকা অনুযায়ী। এ সম্বন্ধে তোমাকে লণ্ডনেই একজন সব রকমে সাহায্য করতে পারবেন, তিনি বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী রামগোপাল, এখানেই থাকেন।"

"রামগোপালের নাম শুনেছি, এখানে এসেই তাঁর খোঁজ করেছি। তিনি এখন আমেরিকায়।"

"তাহলে তো খুব কঠিন হবে এ বিষয়ে কিছু জানানো। এখানকার ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে হয়তো কিছু বই থাকতে পারে, আমি খোঁজ নিতে পারি।"

"কষ্ট করে দেখবে একটু? আমাদের তিন সপ্তাহের শো। এক মাস থাকবো এখানে, তারপর জর্মনী, ইটালি ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় যাবো। যাবার আগে যদি কোনো বইপত্র জোগাড় করতে পারো, জানিও। তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি!"

"না না, মোটেই কষ্টের ব্যাপার নয়। এ তো আনন্দের কাজ! যদি কিছু পাই অবশ্যই জানাবো তোমাকে মারিয়ানে!"

তার নাম উচ্চারণে হয়তো আমার কণ্ঠস্বরে কাব্যিক ভাবের ছোঁয়া লেগেছিল। সে বললে, "এবার ঠিক হয়েছে!"

"কি ঠিক হয়েছে?"

"মারিয়ানে নামটা!" সে হাসল, বললে, "তুমি উঠে ঐ বোর্ডের বেলটা একটু দয়া করে বাজাবে?"

আমি বেল দিয়ে এসে বসলাম চেয়ারে।

মারিয়ানে এবার তার পা ছড়িয়ে কাত হয়ে শুল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে। নীচু হয়ে বালিশের ওপর শোবার ফলে তার উন্নত স্তনের অনেকখানি অংশ ব্রা থেকে উন্মুক্ত হল, পায়ের দিকের ম্যাক্সির প্রান্ত উঠে গিয়ে তার সুগঠিত পা-দুটি হাঁটু অবধি প্রকাশ করল।

অপরূপা মারিয়ানে! যেন নিপুণ ভাস্করের সৃষ্টি!

তার সেদিকে হুঁস নেই।

দরজা ঠেলে একটি মেড ঢুকল। তাকে মারিয়ানে বললে,

"প্লীজ মিস, আমার খাবার দিয়ে যাও। আর আমার ম্যানেজারকে একটু পাঠিয়ে দাও।"

মেড বেরিয়ে যেতে বললে, "তুমি খেয়ে এসেছ ?"

"না, পরে খাবো।"

"সে হয় না। আমার সঙ্গে খাবে তুমি। আমি অল্পই খাই। ওরা দেয় অনেক। আজ আমার জন্যে স্প্যানিশ রাইস ও স্প্যানিশ ওমলেট বানাতে বলেছি।"

একটি লোক দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতে মারিয়ানে তার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলল। দু'বার আমার নামটা উচ্চারিত হতে শুনলাম, সে চলে গেল, সেই বোধ হয় ম্যানেজার।

মারিয়ানে বললে, "তুমি তো একজন সাহিত্যিক, আমাদের দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানো ?"

"গারসিয়া লোরকার নাটক ও কবিতা আমার অত্যন্ত প্রিয়। ইংরেজি অনুবাদে অবশ্য !"

"রিয়েল !" খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে মারিয়ানে উঠে বসল। বললে, "জানো, আমার দিদিমা লোরকার এক বান্ধবী ছিলেন ?"

"আচ্ছা !" আমিও খুশি হলাম শুনে।

"লোরকার কোন নাটক পড়েছ তুমি ?"

"একটি মাত্র নাটকই পড়েছি তাঁর। 'দি উইচক্রাফ্ট অফ এ বাটারফ্লাই'।"

"এক অসাধারণ রূপক নাটক! মাদ্রিদের এক মঞ্চে মাত্র দু'রাত অভিনীত হয়েছিল নাটকটি।" মারিয়ানে বললে।

বললাম, "সেই নাটকের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। লোরকার এক বন্ধু মাদ্রিদে সে নাটকের অভিনয় দেখে এসে গল্পটি বললে সেটাই পরে ছাপা হয়।'

আগ্রহে চোখ দুটি জ্বলতে লাগল মারিয়ানের। বললে, "দেশে থাকতেই জানতে লোরকার নাম ? তাঁর সাহিত্য কাব্য ?"

"এখানে এসে জেনেছি। তাঁর একটা বইও আছে আমার কাছে।"

"আচ্ছা! তাতে 'দি উইচক্রাফ্‌ট অফ এ বাটারফ্লাই' আছে?"

"আছে!"

"সত্যি! বইটা আমাকে একটু দেবে পড়তে? ইংরেজিতে সব অনুবাদ আমি পড়িনি! তবে তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ আমার খুব প্রিয়! যেমন 'গীটার'। পড়েছ কবিতাটি?" বলেই সে আপন মনে অনুচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করে উঠল —

"দি ল্যামেণ্ট বিগিন্‌স্‌
অফ দি গীটার
দি ওয়াইন কাপ্‌স্‌ অফ ডন
আর স্প্লিণ্টার্ড এফার।
দি ল্যামেণ্ট বিগিন্‌স্‌
অফ দি গীটার।
ইট্‌স্‌ ইম্পসিবল্‌, য়ুসলেস,
টু গেট ইট টু স্টপ।
ইট উইপ্‌স, মোনোটোনাসলি,
এ্যাজ দি রেন, ড্রপ বাই ড্রপ.
অর এ্যাজ দি উইণ্ড উইপ্‌স
অন দি স্নোপিক্‌স্‌ টপ।
ইট ইজ ইম্পসিব্‌ল্‌
টু গেট ইট টু স্টপ।
ইট গ্রীভ্‌স্‌ কর থিংগ্‌স
ফার আউট অফ সাইট—
লাইক দি হট সাদার্ণ স্যাণ্ড্‌স্‌
ফর ক্যামেলিয়াস হোয়াইট।
ইট উইপস, দি টারগেটলেস এ্যারো,
দি ইভ উইদাউট মরো,

এণ্ড দি ফার্স্ট বার্ড অন দি বাও
ট্ পেরিশ ইন সরো।

ও দি গীটার, দি হার্ট
দ্যাট ব্লীডস্ ইনটু দি শেড্স্
টেরিবলি উণ্ডেড
বাই ইটস ফাইভ ব্লেড্স্!"

সুললিত সুমধুর কণ্ঠে স্পষ্ট ইংরেজিতে পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করল মারিয়ানে! অপূর্ব তার বাচন ভঙ্গী, কণ্ঠের গমক! স্বর বিন্যাস! আবৃত্তির ধরণ! সে যে জাত-শিল্পী, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!

এ এক অভূত-পূর্ব অভিজ্ঞতা!

একজন প্রাইমা-ব্যালেরিনা যার নাচই শখ ও পেশা, সে যে শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাসের বিষয় এতটা জ্ঞান সঞ্চয় করবে, আগ্রহ পোষণ করবে, এমন সুন্দরভাবে সংস্কৃতি সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানীর মতো আলাপ করবে, আর এই তরুণ বয়সে এমন পরিণত মনের পরিচয় দেবে—এ নিজে না দেখলে শুনলে বিশ্বাস করতাম না হয়তো! মারিয়ানে যে শুধু তার রূপ যৌবন নৃত্যকলা দিয়েই স্পেন ও ফ্রান্সের কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মন জয় করেছে তা নয়, তার অন্যান্য গুণাবলী ও সংস্কৃতির জন্যেও সে ঐ সব মানুষের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে, এ কথা বুঝতে পেরে মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। এমন এক শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় অবশ্যই একটি স্মরণীয় ঘটনা!

খাবার সাজিয়ে ট্রে হাতে মেড ঢুকল। সামনের টেবিলে ট্রে রেখে দিতে মারিয়ানে বললে, "থ্যাঙ্ক মিস, তুমি যেতে পারো।"

সে চলে গেল।

"এ হল স্প্যানিশ রাইস ও ওমলেট। খেয়েছ কখনো?"

"না।"

সে উঠে দুটো প্লেটে খাবার ভাগ করল। নিজের প্লেটে নিল

সামান্য খাবার, বাকী সবটাই আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "বিশ্বাস করো, আমি বেশি খাই না। রাত্রে তো নয়ই। জানো তো, বেশি খেলে আমাদের ফিগার রাখা যায় না।" হাসল সে।

খাদ্যের সঙ্গে আইসক্রীম, পানীয়ও ছিল। সে দুটো গেলাসে পানীয় ঢেলে একটা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের গেলাস তুলে নিল, একটু হেসে বললে, "চিয়ার্স!"

"চিয়ার্স!" আমি যদিও পানীয়র ভক্ত নই, তবু তার দেওয়া পানীয় প্রত্যাখ্যান করলাম না।

ম্যানেজার এসে ঢুকল। হাতে একটা খাম। সেন্টার টেবিলে সেটি এ্যাশট্রে চাপা দিয়ে রেখে মারিয়ানেকে কিছু বলে বেরিয়ে গেল।

মারিয়ানে খেতে খেতে বললে, "লোরকার আর একটা কবিতা খুব বিখ্যাত। আমার ভীষণ প্রিয়। কারণও আছে। ওটা আমার পরিবারের এক পূর্বপুরুষকে উদ্দেশ করে লেখা। ইগনেশিও সাঁসেজ মেজিয়াস। তিনি লোরকার প্রিয় বন্ধু ছিলেন, নাম করা বুল ফাইটার। খেলা দেখাতে গিয়ে মারা যান বুলের আঘাতে রিং-এর মধ্যে। লোরকার প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল, তিনি তখন সেই কবিতা লিখেছিলেন। বেশ বড় কবিতা।"

এই কবিতাটি আমারও প্রিয়। কবিতার ভাব ভাষা ও ছন্দের জন্যে বহুবার পড়ার ফলে মুখস্থ হয়ে গেছিল আমার। আমি মারিয়ানের দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করলাম—

"এ্যাট ফাইভ ইন দি আফটারনুন।
ইট ওয়াজ এক্‌জ্যাক্‌ট্‌লি এ্যাট ফাইভ ইন দি আফটার নুন।
এ বয় ব্রট দি হোয়াইট শীট
এ্যাট ফাইভ ইন দি আফটারনুন।
এ ফ্রেল অফ লাইম রেডি প্রিপেয়ার্ড
এ্যাট ফাইভ ইন দি আফটারনুন।

দি রেস্ট ওয়াজ ডেথ, এ্যণ্ড ডেথ এলোন
এ্যট ফাইভ ইন দি আফটারনুন !

*　　*　　*

এ কফিন অন হুইল্‌স্‌ ইজ হিস বেড
এ্যট ফাইভ ইন দি আফটারনুন।
বোন্‌স্‌ এণ্ড ফ্লুট্‌স্‌ রিসাউণ্ড ইন হিজ ইয়ার্স।
এ্যট ফাইভ ইন দি আফটারনুন।
নাও দি বুল ওয়াজ বিলোয়িং থ্রু হিজ ফোরহেড
এ্যট ফাইভ ইন দি আফটারনুন।
ইন্‌ দি ডিসটেন্স দি গ্র্যাংগ্রীন নাও কাম্‌স্‌
এ্যট ফাইভ ইন দি আফটারনুন।
হর্ণ অফ দি লিলি থ গ্রীন গ্রয়েন্‌স্‌
এ্যট ফাইভ ইন্‌ দি আফটারনুন।
দি উইণ্ড্‌স্‌ ওয়্যার বার্ণিং লাইক সানস
এ্যট ফাইভ ইন্‌ দি আফটারনুন
এ্যণ্ড দি ক্রাউড ওয়াজ ব্রেকিং দি উইণ্ডোজ
এ্যট ফাইভ ইন্‌ দি আফটারনুন।
আহ ! দ্যাট ফ্যাটাল ফাইভ ইন দি আফটারনুন !
ইট ওয়াজ ফাইভ বাই অল দি ক্লক্‌স্‌
ইট ওয়াজ ফাইভ ইন দি শেড অফ দি আফটারনুন !"

নিঃস্তব্ধ নির্বাক বিস্ময়ে পানীয়র গেলাস হাতে ধরে রেখে মারিয়ানে আমার আবৃত্তি শুনছিল। পরিবেশ আলো স্থান কাল ও শ্রোত্রী সব কিছুই বুঝি কাব্যেরই অনুকূল ! ওমর খৈয়াম এই রকম এক পরিবেশেই হয়তো তাঁর কালজয়ী বিশ্ববিখ্যাত কাব্য রচনা করে গেছেন ! আমি যে অন্য এক অসাধারণ কবির অনন্যসাধারণ কবিতা আবেগ ভরে

আবৃত্তি করবো এতো স্বাভাবিক ব্যাপারই! কবিতার ভাব, ভাষা, ছন্দ, ইংরেজিতে অনুদিত শব্দ-ঝংকার যেন ঘরের বাতাসকে করুণ সুরে ভরিয়ে দিল! মারিয়ানের অন্তরেও যেন সে সুর বাজতে লাগল বেদনার ছন্দে!

অনেকগুলি নিঃস্তব্ধ মুহূর্ত গেল কেটে!

এক সময়ে মারিয়ানে গেলাস নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপরে। তার খাওয়া হয়ে গেছিল। চোখে মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি, তার অপরূপ মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললে, "আমার জীবনে এমন আনন্দ আমি খুব কম পেয়েছি সেন! মনের যে আনন্দের খোরাক তুমি আজ আমাকে দিলে, এর চেয়ে বড় আনন্দ দেহের মিলনে কেউ আজো দিতে পারে নি আমাকে!"

তাকিয়ে দেখলাম সেই বিচিত্ররূপিনী আশ্চর্য চরিত্র মোহময়ী রূপসী শিল্পীকে! আমার কাছে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা! আমার মনও আনন্দে ভরে গেছে আজ! দু'টি ভিন্ন দেশী ভিন্ন ভাষাভাষী অনাত্মীয় সদ্যপরিচিত যুবক যুবতী যাদের একজন শিল্পী অন্যজন সাহিত্যিক, কেবলমাত্র কাব্যচর্চার মধ্যে দিয়ে এতখানি নৈকট্য অনুভব করতে পারে, প্রাণের সজীব স্পর্শ পেতে পারে, মনের এত কাছে এসে যেতে পারে, মনের মানুষ হয়ে একাত্ম হতে পারে—এমন অভিনব উপলব্ধি আমার এই প্রথম! যুবতী নারী যে পুরুষের কেবলমাত্র সম্ভোগের পাত্রী নয়, দৈহিক মিলনেই আনন্দ পাওয়ার যন্ত্র সে নয়, তার চেয়েও সে অনেক বেশি কিছু, বড় কিছু,—আনন্দ উপলব্ধি বর্ধনে ও পরিবেশনে তার ভূমিকা যে কত সুন্দর ও মহান হতে পারে—সে কথা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করলাম মারিয়ানের সংস্পর্শে এসে!

মারিয়ানের মতো প্রাইমা ব্যালেরিনা গুণী কৃতি নৃত্য-শিল্পী আরো আছে জানি, কিন্তু তাদের মধ্যে কতজন তার মতো বিদগ্ধ সংস্কৃতি সম্পন্ন শিল্পী-কবি মনের অধিকারিনী আছে—জানা নেই!

রাত হয়ে গেছিল বেশ; সেদিকে আমাদের খেয়ালই ছিল না।

হাত ঘড়িতে সময় দেখে উঠে পড়লাম। আমারো খাওয়া হয়ে গেছিল। পাশের বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি মারিয়ানে বিছানা থেকে উঠে সেণ্টার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপরে রাখা খামটার মধ্যেকার একটা কার্ড দেখছে।

আমাকে বললে, "এটা তোমার।"

"আমার ? কি এটা ?"

সে আমার হাতে খামটা দিল। ওপরে আমার নাম টাইপ করা, ভিতরের কার্ডটি একটি ছাপ মারা নম্বর লেখা গেস্ট কার্ড। আগামী কালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি প্রাইমা-ব্যালেরিনা মারিয়ানের সম্মানিত অতিথি, তারই নিমন্ত্রণ-লিপি !

বিস্ময়ে আনন্দে বলে উঠলাম, "য়ু আর গ্রেট মারিয়ানে !"

সে হাসল একটু, বললে, "শো ছ'টায় শুরু। বাট এ্যট দি হল মিট মি ইন দি ক্লোক রুম এক্‌জ্যাক্‌ট্‌লি—"

"এ্যট ফাইফ ইন্ দি আফটারনুন ! রাইট ?"

আমার কথায় মারিয়ানে সুমধুর দৃষ্টিতে তাকাল। চোখের ওপরে চোখ রেখে বললে, "য়ু আর সুইট !"

আমার হাত সে তার নরম কোমল হাত দিয়ে ধরল, পরম সমাদরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল, উষ্ণ হাতে হৃদ্যতার সঙ্গে আমার করমর্দন করল কয়েক মুহূর্ত ধরে, চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার, মধুর স্বরে বললে, "গুড নাইট সেন !"

"গুড নাইট মারিয়ানে ! সুইট ড্রিম্‌স্ !"

আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময়ে দেখলাম সে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে, মুখে অপরূপ হাসির ছটা !

নর্থ সী'র ঝড়

বিশ্বাসঘাতক সমুদ্র বলে কুখ্যাতি আছে নর্থ সী'র। দিব্যি শান্ত চেহারা এমনিতে, হঠাৎ প্রলয় শুরু হয়ে যায় কখন—কেউ বলতে পারে না। বিশেষ, শীত কালের রাতগুলি প্রায়ই ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে দেখা দেয় সাগর পারাপারে জাহাজের যাত্রীদের কাছে।

সেবার যাচ্ছিলাম জর্মণী। লণ্ডন থেকে ট্রেণে হারউইচ বন্দরে এসে ধরলাম জাহাজ—ওপারে রটারডাম বন্দর, হল্যাণ্ডের উপকূল। সেখান থেকে আবার ট্রেণে যেতে হবে।

রাতের আকাশ। নিকষ কালো রং, সম্পূর্ণ মেঘে ঢাকা। সমুদ্রের কালো জলের সঙ্গে আকাশের সীমানা কোথায় যে মিশে গেছে একাকার হয়ে—বোঝা দুষ্কর!

অভিজ্ঞ যাত্রীরা আকাশের এই অবস্থা দেখেই বুঝেছে ঝড় উঠবে। এই থমথমে মেঘে ছাওয়া আকাশ আর নিরীহ নিথর জলরাশি বাধিয়ে দেবে প্রলয় কাণ্ড।

জাহাজের কর্মচারীরাও সতর্কতার সব আয়োজনে ব্যস্ত। যাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হল তারা যেন জাহাজ ছাড়ার পর ডেকে না ওঠে। যার যার কেবিনেই যেন আশ্রয় নেয়।

এইটুকুই যথেষ্ট যাত্রীদের মনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলার পক্ষে। তবু আতঙ্কিত নয় কেউ। য়ুরোপের দেশগুলির মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল, নর্থ সী আর আটলান্টিক পারাপার তাদের করতে হয় প্রায়ই। এ সবে অভ্যস্ত তারা।

তবু বিপদকে কে না ভয় করে!

আমার কেবিনের অপর যাত্রিটি একজন ডাচ। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। বর্তমানে হীরে জহরতের ব্যাপারী।

জাহাজ ছাড়বে রাত ন'টার পর। কিন্তু আটটার মধ্যেই বেশীর ভাগ যাত্রীরাই আশ্রয় নিয়েছে কেবিনে। কিছু সংখ্যক যাত্রী অবশ্য জাহাজ ছাড়ার অপেক্ষায় ঘুরছে ডেকে, নয় তো বসে আছে স্মোকিং লাউঞ্জে অথবা বার-এ।

আমার কেবিনের সহযাত্রী বলছিলেন তাঁর বিগত দিনের নানা অভিজ্ঞতার কথা। বিশেষ, এই রকম ঝড়ো রাতে সমুদ্র যাত্রার কথা। পুরু নরম গদীর বিছানায় শুয়ে সে গল্প শুনতে মন্দ লাগছিল না।

গল্প শুনতে শুনতে বুঝতে পারি নি, কিন্তু হঠাৎ মনে হল জাহাজ চলছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ন'টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। অর্থাৎ আমরা এখন সমুদ্রের বুকে!

দোলানি ক্রমশই বাড়তে লাগল। শুয়ে থাকতে পারছি না—এত জোর দোলা।

দরজায় নক করে কেবিন ষ্টুয়ার্ড রেখে গেল কাগজের এক ঝুঁড়ি ঠোঙা। আগেই ছিল কেবিনে রাখা কয়েকখানি ঠোঙা—আরো দিয়ে গেল। সী সিক্‌নেসের ব্যবস্থা।

অতগুলি ঠোঙা দেখেই বোধ হয় আমার সহযাত্রীর বমনের উদ্রেক হল। শুরু হল তাঁর সী সিকনেস।

একে তো বিপুল দোলানী, তার ওপর সহযাত্রীর অবস্থা আমারও সারা শরীরকে বিষিয়ে তুলল। মনে হল আমিও বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়বো।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম বিছানা থেকে। স্লীপিং সুট-এর ওপরে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে বেরিয়ে এলাম কেবিন থেকে ঘরের বিশ্রী অবস্থার হাত থেকে বাঁচার জন্যে। অনেকবার সমুদ্র পারাপার করেও সী সিকনেস আমার হয়নি, কিন্তু দৃশ্যটি আমার ভাল লাগল না।

লম্বা করিডর চলে গেছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি। কিন্তু সোজা হাঁটবার উপায় কই? প্রচণ্ড দোলায় খাড়া পা ফেলতে পারছি না। দু'পাশের দেওয়াল ধরে এগোতে লাগলাম।

করিডরের শেষে সিঁড়ি, নীচে এবং ওপরে যাবার। দেখি কয়েকটি কেবিন ষ্টুয়ার্ড ছোটাছুটি করছে কাগজের ঠোঙা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে—কেবিনে কেবিনে প্রয়োজন হচ্ছে!

একজন ষ্টুয়ার্ড সতর্ক করে দিল আমাকে, 'বাইরে ঘুরবেন না স্যার। কেবিনে ফিরে যান।'

কিন্তু কেবিনে ফেরার ইচ্ছে হল না। ষ্টুয়ার্ডটি অন্য দিকে ঘুরে চলে যেতেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠতে লাগলাম। সমুদ্রের বুকে ঝড়ের রূপ দেখার লোভও কম নয়!

প্রকাণ্ড ডেকটা একেবারে খালি। ওপরে উঠে বুঝলাম জাহাজ কি প্রচণ্ড বেগে দুলছে, বাতাস বইছে ঠিক সেই অনুপাতে। আকাশ আর সমুদ্রের রং একেবারে পিচকালো।

বেশ রোমাঞ্চ লাগছিল, কিন্তু এ ভাবে এখানে দাঁড়ানো যে অত্যন্ত বিপদ জনক বুঝতে পারলাম, তাই নীচে নামবার জন্যে সিঁড়ির কাছে যেতেই হঠাৎ চোখ পড়ল ডেকের অপর দিকে রেলিংএর ওপর ভর দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে!

খুব সাহস তো!

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম। কিন্তু ঝড় উল্টো দিকে বইছে, আমার কথাগুলো যাত্রীর কানে নিশ্চয়ই পৌঁছল না।

স্কার্ট ও জ্যাকেট পরা। মাথায় স্কার্ফ উড়ছে! পা দু'টি খোলা, দূর থেকেই দেখতে পেলাম নাইলনের মোজায় মোড়া পা' দু'খানি!

এই ভয়ঙ্কর রাতে ডেকের ওপর একজন নারী!

একটি নারীর সাহস দেখে আমারো সাহস বাড়ল। আমি এগিয়ে গেলাম তার দিকে। কিন্তু ঝড়ের তোড়ে এগোতে পারছি কই! ওলট পালট চলছে জাহাজের বুকে। সোজা দাঁড়ানোই যাচ্ছে না।

কোনো রকমে এগিয়ে চললাম মেয়েটির দিকে।

দেখলাম সেই যাত্রিনীটি রেলিং ধরে আরো এগিয়ে চলেছে সহজ গতিতেই জাহাজের শেষ প্রান্তের দিকে!

আমি অনেক কষ্টে প্রায় দৌড়িয়ে এগিয়ে গেলাম তার কাছে।

বোধহয় আমার পদশব্দ শুনে থাকবে সে। সে এবার ফিরে তাকাল।

চেয়ে দেখলাম একটি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ! আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখছে!

আমি বলে উঠলাম, 'তোমার জীবনের ওপর মায়া নেই? তুমি কি মৃত্যুর জন্যে তৈরী হয়ে এসেছ এখানে?'

সে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, আমি থামতেই সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'তুমি! তুমি এসেছ!'

আমি তার কথায় অবাক হয়ে বললাম, 'তার মানে? আমাকে তুমি চেন না কি?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে সে বললে, 'আমাকে চিনতে পারছ না? আমি এ্যাড্রিয়ানা।'

এ্যাড্রিয়ানা! জাহাজের ডেকের স্বল্প আলোয় তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। কিন্তু কোনো ক্রমেই তাকে আমার পূর্ব-পরিচিত বলে মনে হল না।

সে আমাকে তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পারছো না! আমাকে তুমি ভুলে গেলে!'

তার কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়ল।

সেই প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে জাহাজের ডেকের ওপর দুলতে দুলতে আমার অতীত স্মৃতি মন্থন করে চললাম। তাকে লণ্ডনের বা অন্যত্র কোনো নাচের আসরে, ক্লাবে, পার্টিতে, কিম্বা পথে ঘাটে কোথাও এর আগে দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

সে বলে উঠল, 'সুব্রত! তুমি না আমাকে একদিন ভালবাসতে। আমাকে ছাড়া তোমার সেদিন এক মুহূর্তও চলতো না······তারপর······'সে থেমে গেল।

এবার বুঝতে পারলাম সুব্রত নামে কোনো এক ভারতীয়র সঙ্গে বোধ হয় কিছু মিল আছে আমার চেহারায়। সে আমাকে তাই সুব্রত মনে করেছে।

আমি বললাম, 'আমাকে ভারতীয় দেখে তুমি ভুল করছো সুব্রত বলে। আমি সুব্রত নই। এখানে আমি ঐ নামে কাউকে চিনিও না!'

সে ফাঁস করে গর্জন করে উঠল, 'মিথ্যেবাদী, তুমি সুব্রত নও! আমার সঙ্গে দীর্ঘ চার বছর প্রেম করেছো তুমি! তোমার দেহের অণু পরমাণু আমার পরিচিত! তোমাকে আমি ভুল করতে পারি!'

বুঝলাম এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। নিশ্চয়ই সুব্রত নামে কোনো এক ভারতীয়র সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ তার জীবন। প্রবঞ্চিত হয়েছে সে প্রচণ্ড ভাবে যার ফলে ঘটেছে তার চিত্ত-বিভ্রম। হয় তো মস্তিষ্ক বিকৃতিও!

যে মুহূর্তে এ কথা আমার মনে হল, সেই মুহূর্তে আমার মন আশংকায় উঠল ভরে! এ এখানে এল কি করে! এর সঙ্গে কি কেউ নেই! থাকলে সে এই রকম একজন বিকৃত-মস্তিষ্ক মেয়েকে নজরের বাইরে যেতে দিল কেন!

আমার নীরবতার মধ্যে এ্যাড্রিয়ানা (জানি না এ নাম তার সত্য নাম কি না!) এগিয়ে এল আমার কাছে। তারপর দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বললে, 'সু, আমি তোমার এ্যাড্রিয়ানা! আমাকে চিনতে পারছো না তুমি! দেখ চেয়ে··· আমি তোমার সেই এ্যাড্রিয়ানা! ···ঠিক তেমনি আছি···কোনো পরিবর্তন হয়নি···।'

তার দিকে তাকালাম। এ রকম একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় এর আগে পড়ি নি কখনো। দিগন্ত জুড়ে প্রকৃতির দুর্যোগ; ঝড়ের দাপাদাপি, নীচে চারপাশে ঢেউ এব নাচানাচি—এ্যাড্রিয়ানা আমাকে জড়িয়ে ধরে তার ওষ্ঠ দু'টি একটু ফাঁক করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে উন্মুখ হয়ে।

একটি সুন্দরী যুবতীর ঘন আলিঙ্গন আমার বুকের ভিতরটাও তোলপাড় করে তুলল বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তার নিবিড় আলিঙ্গনে আমার শরীরের রক্ত-কণিকাগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল।

সে তার মুখ উঁচু করে আমার ওষ্ঠে দীর্ঘ একটি চুম্বন করল। তার সেই উষ্ণ ওষ্ঠের স্পর্শে আমার শরীরে শিহরণ গেল বয়ে। ভুলে গেলাম চারপাশের পরিবেশ, ভুলে গেলাম সে একটি বিকৃত-মস্তিষ্ক মেয়ে, ভুলে গেলাম আমি সুব্রত নই। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে কঠিন বন্ধনে। যৌবনের প্রচণ্ড আবেগে কেঁপে উঠল দু'জনের দেহ থর থর করে।

জাহাজের সেই দোলায় সে আমার আলিঙ্গনের মধ্যে দুলতে লাগল। চোখ দুটি বন্ধ করে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকল কিছুক্ষণ। মনে হল যেন হাজার বছর পেরিয়ে গেল!

এক সময়ে এ্যাড্রিয়ানা মুখ তুলে তাকাল, গাঢ় স্বরে বললে, 'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে সু।'

আমি কোনো কথা না বলে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সে বললে, 'চল, ঐ জায়গায় বসি গিয়ে।' হাত দিয়ে সে মাস্টের পাশে অন্ধকার জায়গাটিকে দেখাল।

সমুদ্রের দিকে তাকালাম, ভয়ঙ্কর রূপ তার, আক্রোশে যেন ফুলে ফুলে ফুঁসে উঠেছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, সর্বত্র অতল স্পর্শ থমথমে ভাব।

জাহাজ দুলছে সমানে, দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এ্যাড্রিয়ানা তখনো সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। দু'চোখে তার কোটি বর্ষের বুভুক্ষু চাহনি।

বললাম, 'এ্যাড্রিয়ানা, চল আমরা নীচে যাই। এখানে থাকা নিরাপদ নয়। জাহাজ কি রকম দুলছে দেখছো! যদি আরো বেশী দোলে তাহলে একেবারে গড়িয়ে পড়বো ডেকের ওপর, আর যদি ঐ ঢেউগুলি উঁচু হয়ে আছড়ে পড়ে ডেকের ওপর, তাহলে—' এ্যাড্রিয়ানা

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'তাহলে বে-শ হবে! আমরা দু'জনে এক সঙ্গে মরবো এই সুন্দর সমুদ্রের বুকে!'

বুঝতে পারলাম তাকে বুঝিয়ে কিছু হবে না। বরং তার ইচ্ছাতে বাধা দিতে গেলে আরো বেশী বেঁকে বসবে! তবু বললাম, 'জাহাজের কোনো ক্রু যদি হঠাৎ ওপরে উঠে আসে, আর আমাদের এ অবস্থায় দেখে তাহলে কি বিশ্রী অবস্থা হবে বল তো?'

এ্যাড্রিয়ানা সে কথা কানে তুলল না, বললে, 'বহু বছর পরে তোমাকে কাছে পেয়েছি সু! বহু বছর পরে! আমি তোমাকে ছাড়বো না। এখানে এখন থাকবো আমরা···তাছাড়া নীচে অনেক লোকজন···'

আমি আর কিছু বললাম না। তাকে ধরে মাস্টের পাশে গিয়ে বসলাম। আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে গেছিলাম।
বুঝতে পারছিলাম অত্যন্ত বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বসেছি! চারিদিকে বিপদের সংকেত!

কিন্তু সোজা হয়ে বসাও দায়! এ্যাড্রিয়ানা আমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। যে আদর আলিঙ্গন চুম্বন আমার পাওনা নয়—তা গ্রহণ করতে অত্যন্ত সংকুচিত হচ্ছিলাম। নিজেকে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আরো দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

এমনিতে সহজ স্পষ্ট কথাবার্তা, সংগতিপূর্ণ। সেই প্রায় অন্ধকারেই দেখতে পাচ্ছিলাম তার অপূর্ব মুখখানি ম্লান, মনে হল অনেক রাত জাগার ক্লান্তি তার সারা শরীরে।

'সু!'

'বল।'

'তুমি আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেছিলে সু? কেন ভুল বুঝেছিল? কেন ভেবেছিলে জনের সঙ্গে আমার মেলামেশা বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু!···তার সঙ্গে তো আমার প্রেম ছিল না!'

একটা বিয়োগান্ত নাটকের আভাষ পাচ্ছিলাম তার কথায় অতীতের একটা রোমান্টিক অধ্যায় পড়ছি যেন! সুব্রত, এ্যাড্রিয়ানা ও জন। ত্রিভূজ প্রেম-পর্ব-ভালবাসা আর ভুল বোঝাবুঝি। যেখানে ভালবাসা গভীর, সেখানেই ভালবাসার পাত্রকে হারাবার আশংকা! ভুল বোঝা বুঝির পালা! সন্দেহ ও ঈর্ষা ভালবাসার নিত্য সহচরী!

এ্যাড্রিয়ানা আমার ঠোঁটে সমানে চুম্বন করে চলল। আমি যথাসম্ভব নিজের চাঞ্চল্য দমন করে বসে রইলাম।

সে আমার দিকে এক সময়ে তাকিয়ে বললে, 'তুমি তো এত ঠাণ্ডা ছিলে না সু! তোমার চুম্বনের বন্যায় তুমি আমাকে ভাসিয়ে দিতে! এক মুহূর্ত বিরাম দিতে না! ছাড়তে না! সে আমার হাত টেনে নিয়ে তার সেই যৌবন-উদ্ধত বুকের ওপর চেপে ধরল।

আচমকা একটা ধাক্কা লাগল। আমার দেহের মধ্যেই নয়, বাইরেও। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পরপর বিশাল আকারের ঢেউগুলি গর্জন করতে করতে এগিয়ে এসে আছড়ে পড়ল জাহাজের গায়ে। মুহূর্তে এ্যাড্রিয়ানাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে চোখ' বন্ধ করলাম।

জাহাজটি সেই ধাক্কায় হেলে পড়ল এক পাশে। আমরা গড়িয়ে চললাম সেই আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই ডেকের ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে!

যখন চোখ মেলে তাকালাম, দেখি আমি শুয়ে আছি জাহাজের হাসপাতালের এক বেডে।

মাথার মধ্যে যেন ঝিম ঝিম করছে। প্রথমে কিছু মনে করতে পারলাম না। মাথায়, ঘাড়ে বুকে সব শরীরে অসম্ভব ব্যথা।

কানে এল অস্ফুট কান্নার শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি এক পাশে একটি বেডে একজন শায়িত—মাথা পর্যন্ত সাদা চাদরে

তার শরীর ঢাকা। বেডের ওপরে বসে তার বুকের মধ্যে মাথা রেখে একজন প্রৌঢ়া কাঁদছেন!

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে জাহাজের একজন কর্মচারী। গলায় ষ্টেথস্কোপ ঝোলানো, এ্যাপ্রণ পরা ডাক্তার। তিনি বলছেন, 'আপনার মেয়ের মতো একজন কড়া মেণ্টাল পেসেণ্টকে এ ভাবে নজরের বাইরে যেতে দেওয়া আপনার উচিত হয় নি। আপনি ঘুমিয়ে না পড়লে সে এ ভাবে ডেকে উঠে যেত না। আর—'

আমার ওপর হঠাৎ তাঁর চোখ পড়তেই তিনি থেমে গেলেন। আমার কাছে এসে বললেন, 'এখন সুস্থ বোধ করছেন?'

তিনি আমার হাত টেনে নিয়ে নাড়ী টিপলেন।

আমি কোনো কথা বললাম না। শুধু তাকিয়ে রইলাম পাশের বেডের দিকে।

নর্স এসে দাঁড়াল কাছে। ডাক্তার বললেন, 'এঁকে গরম দুধ দাও ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনিও অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ করেছিলেন! কিন্তু আপনার দুঃসাহসের জন্যেই মেয়েটি জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে নি। আপনি ঠিক সময়ে ওপরে গিয়ে ওকে জাপটে না ধরলে ও নিশ্চয়ই জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তো সমুদ্রে। সুইসাইডাল টেনডেন্সী ছিল!'

আমি মূক হয়ে গেছিলাম, কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না।

ডাক্তার একটু থেমে বললেন, 'ডেকের ওপরেই ও হার্টফেল করেছে!'

আমি চুপ করে তাকিয়ে রইলাম পাশের বেডে শায়িত সাদা চাদরে ঢাকা দেহটির পানে। এ্যাড্রিয়ানা ভুল করেছিল আমাকে সুব্রত মনে করে? অথবা সকল ভারতীয়র মধ্যেই সে সুব্রতকে খুঁজে খুঁজে বেড়াতো! ডাক্তার মনে করলেন তাকে অনুসরণ করেই বুঝি আমি ডেকে উঠেছিলাম!

ডাক্তার বললেন, 'আপনি শুয়ে থাকুন, "হুক অফ হল্যাণ্ডে" পৌঁছতে এখনো ছ'ঘণ্টা দেরী। নর্স এসে আপনাকে ঠিক সময়ে তুলে নিয়ে যাবে আপনার ক্যাবিনে।'

তিনি নর্সকে ইসারা করে বেরিয়ে গেলেন। নর্স তাঁর অনুসরণ করল।

প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা এ্যাড্রিয়ানার মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন, তারপর এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এ্যাড্রিয়ানার সেই নিথর নিস্পন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, সে যে তার সুব্রতর বুকের মধ্যে মাথা রেখে মারা গেছে, এই বিশ্বাস নিয়েই কি সে শেষ মুহূর্তে সান্ত্বনা লাভ করেছে! খুশীতে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে কি এই ভেবে, যে মৃত্যুর আগে তার প্রিয়তমকে সে দেখতে পেয়েছে! শেষ মুহূর্তে তার সে ভুল ভাঙে নি তো? এই বিশ্বাস নিয়েই কি সে যেতে পেরেছে এই পৃথিবী ছেড়ে, যে তার সুব্রত শেষ পর্যন্ত তাকে প্রবঞ্চিত করে নি, ফিরে এসেছে সে তার কাছে! তারই আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া ফিরে পাওয়া প্রেমিক তার শেষ চুম্বনকে সার্থক করতে! মৃত্যুর আগে এই কথাই কি সে জেনে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে যে, এই পঙ্কিল ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে এখনো ভালবাসার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায় নি! ভালবাসার এখনো সে শক্তি আছে যার জোরে সে শেষ সময়ে তার প্রিয়তমকে ফিরে পেয়েছে!

জুতোর মশ মশ আওয়াজ করতে করতে দু'জন হসপিটাল ষ্টুয়ার্ড ঘরে ঢুকল স্ট্রেচার হাতে করে। তারপর সেটি নামিয়ে রাখল এ্যাড্রিয়ানার দেহের পাশে। শেষ কৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে তাকে!

একজন সংকুচিত স্বরে স্ট্রেচারটির দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'ম্যাডাম।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

রাইনগোল্ড এক্সপ্রেস

রাইনগোল্ড এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে বিদ্যুৎবেগে শেষ রাতের বুক চিরে।

এখন আমরা চলেছি হল্যাণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে জর্মণ সীমানার মধ্য দিয়ে। রটারডাম বন্দর থেকে শুরু হয়েছে এই যাত্রা।

বাইরে ঝির ঝির করে তুষার ঝরছে। সাদা সাদা তুলোর মতন তুষার বৃষ্টি সারারাত ধরে। পথ ঘাট ষ্টেশন বাড়ী ঘর, যা পড়ছে পথে —সব সাদা বরফের চাদরে যেন ঢাকা।

কম্পার্টমেণ্টে বসে আছি ওভারকোট পরে, পায়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছি কম্বল। তবু জানুয়ারী মাসের প্রচণ্ড শীত কাঁপিয়ে তুলেছে সারা দেহ।

আমার সামনের বার্থে বসে আছে একজন হল্যাণ্ডবাসী, পাশে একজন ফরাসী, আর কোণের দিকে জর্মণ। রটারডাম থেকেই উঠেছি আমরা সকলে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কারো সঙ্গেই কারো আলাপ হল না।

তাই চুপচাপ বসেছিলাম আর পুরু কাঁচ দেওয়া জানালা দিয়ে দেখছিলাম অন্ধকারের বুকে অবিরাম তুষার ঝরা।

হঠাৎ মনে হল গাড়ীর গতি যেন কমে আসছে ক্রমশ, তারপর সত্যি সত্যি এক সময়ে একেবারেই থেমে গেল।

ভাবলাম হয় তো কোনো ষ্টেশন এল। কিন্তু জানালা দিয়ে আলোর বিন্দুও চোখে পড়ল না।

একটু বাদেই গার্ড করিডর দিয়ে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। বললে, 'সামনের রেল লাইন বরফে চাপা পড়েছে। তাই ট্রেণ যেতে

পারছে না। এই বরফ সরিয়ে তবে যেতে হবে। কাজেই সময় লাগবে।'

'কতক্ষণ?' জর্মণ যাত্রীটি প্রশ্ন করল গার্ডকে।

'বলতে পারছি না। তবে যে রকম অবস্থা তাতে হয় তো বাকী রাতটা কাটবে।'

গার্ড চলে গেল অন্য কম্পার্টমেণ্টে খবর দিতে।

আমরা চারজন যাত্রী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকালাম। হল্যাণ্ডবাসীটি পাশে রাখা একটি জার্ণাল নিল টেনে, আর জর্মণ যাত্রী তার পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে কয়েকটি কাগজপত্র বার করে লিখতে বসল। ফরাসীটি আরো আড়ে শুয়ে বোধ হয় ঘুমোবার চেষ্টা করল।

আমার কিছু করবার ছিল না। খানিকক্ষণ সেই অন্ধকার প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইলাম মোটা কাঁচে ঢাকা জানালা দিয়ে।

অনেক আগেই কলোন পৌঁছে যাবার কথা, কিন্তু সে আর হবে না। কখন যে সেখানে পৌঁছবো জানি না। জানুয়ারী মাস ধরেই প্রচণ্ড তুষার পড়ছে সারা জর্মণীতে। খবরের কাগজে পড়েছি—প্রায়ই ট্রেণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বরফে লাইন ঢেকে গিয়ে, পথের মানুষ মারা গেছে বরফ চাপা পড়ে। পশু পাখী বাঁচছে না। নদীর জল কোথাও কোথাও জমে বরফ হয়ে গেছে। সারা জর্মণীতে এমন প্রচণ্ড শীত আর বরফ না কি গত কয়েক বছরেও পড়ে নি।

লণ্ডনে বসেই এ খবরগুলি পড়েছিলাম। আমি জর্মণীতে যাবো শুনেই বন্ধুরা মানা করেছিল। সেখানকার প্রচণ্ড শীত সহ্য হবে না এ কথা নিজেরও মনে হয়েছিল, তবু যাবার প্রয়োজন ছিল আমার। একজনকে কথা দিয়েছিলাম কলোনে দেখা করবো তার সঙ্গে দেশে ফেরার আগে। ফেব্রুয়ারী মাসেই দেশে ফিরবো, তাই এই শীতের মধ্যেই জানুয়ারী মাসে চলেছি কলোনে আমার সেই কথা রাখতে।

সেই সব কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু এমনি করে বেশীক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগল না। অনেক যাত্রীই করিডর দিয়ে যাতায়াত করছিল। ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমিও উঠে পড়লাম। কম্বলটা গায়ের ওপর জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম কম্পার্টমেণ্ট থেকে।

করিডর ধরে একেবারে চলে গেলাম ইঞ্জিনের পাশের ঘর অবধি, তারপর ফিরে চললাম আবার নিজের কম্পার্টমেণ্টের দিকে। মাঝামাঝি জায়গায় আমার কম্পার্টমেণ্ট ছাড়িয়ে কখন চলে এলাম গাড়ীর একেবারে শেষ প্রান্তে, জানতে পারি নি। হুঁস হল যখন, তখন দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে—আর তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে।

ট্রেণের আলো পড়েছে প্রান্তরের বুকে, তাই সামনের খানিকটা অংশ আলোকিত, তার ওধারে তখনো অন্ধকার আকাশ। হঠাৎ মনে হল সেই অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট সে মূর্তি, তবু পোশাক দেখে মনে হল এক নারী মূর্তি। অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকিয়ে ভাল করে তাকালাম—আশ্চর্য! সে হাতছানি দিয়ে আমাকেই যেন ডাকছে!

পকেট থেকে রুমাল বার করে জানালার ও চশমার কাঁচটা ভাল করে ঘষে নিলাম—তারপর সেদিকে আবার তাকালাম। এবার সেই অন্ধকারে খানিকটা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। তাই দেখতে পেলাম সেই মূর্তি সত্যি সত্যিই আমার দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সারা দেহ তার টপ কোটে ঢাকা। তার ওপর সে পরেছে রেন কোট, মাথাটাও ঢাকা সেই রেন কোটের টুপিতে। একটা রুমাল মুখের কাছে চাপা দিয়ে সে ডাকছে আমায়।

ঐ ঠাণ্ডায় আর বরফে কেউই ট্রেণ থেকে নামেনি, তাই অবাক হয়ে গেলাম। আমি কি স্বপ্ন দেখছি! সেই তুষার জোড়া অন্ধকার প্রান্তরে আপাদমস্তক ঢাকা সত্যিই কি কোনো নারী মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে আর ডাকছে আমাকে হাতছানি দিয়ে! কেনই বা সে ডাকছে আমাকে? সে কি আমার পরিচিত কেউ!

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। দরজাটা খুলে তাকালাম—আমাকে দরজা খুলতে দেখেই সে মূর্তি খোলা প্রান্তর ধরে এগোতে শুরু করল। আমিও তার দিকে তাকিয়ে গাড়ী থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করবো কি না ভাবছি—এমন সময়ে সে ফিরে দাঁড়িয়ে আবার ডাকল ইসারায়।

এবার নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। নামবার আগে একবার করিডরের শেষ অবধি দেখে নিলাম—কেউ কাছাকাছি আছে কি না, কেউ দেখছে কি না! কিন্তু না, কেউ নেই কোথাও।

নেমে একটু এগোতেই কিন্তু মনে সন্দেহ উঁকি দিল। ও কে? শেষ রাতের অন্ধকারে আপাদমস্তক ঢাকা যে নারী মূর্তি এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল আমায়—সে কি আমারই মতন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ! কি এর উদ্দেশ্য এতগুলি লোক থাকতে আমাকেই ডাকবার? আমার সঙ্গে এর কি দরকার? নিজের বোকামকে ধিক্কার দিলাম। কেন নামতে গেলাম এই ফাঁকা প্রান্তরে? কিন্তু এখনো তো ফিরতে পারি!

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম দ্বিধা ভরে। আমাকে দাঁড়াতে দেখে সে ডাকল এবার স্পষ্ট গলায়, 'এস।'

সেই অন্ধকার প্রান্তরে তুষারের মধ্যে যেন জল তরঙ্গ বেজে উঠল। এত মধুর কণ্ঠস্বর তার।

আর দাঁড়ালাম না। সেই মুহূর্তে মনে হল যেই হোক সে, যার এমন মধুর কণ্ঠস্বর, তাকে অনুসরণ করতে আমার আর আপত্তি নেই। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তার সঙ্গে নির্ভয়ে যেন আমি যেতে পারি।

খানিকটা গিয়ে মূর্তিটি থামল। ট্রেণ থেকে যে আলো এতক্ষণ ঠিকরে পড়ছিল সেই অন্ধকারে—সে আলো এবার খানিকটা পিছনে ফেলে এসেছি। এ দিকে অসীম শূন্যতা। তার ওপর অনবরত তুষারপাত। চোখে মুখে এসে ঠিকরে পড়ছে তীক্ষ্ণ তুষার কণা-

গুলি। দৃষ্টি থমকে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই। চশমার কাঁচ জলে ভিজে যাচ্ছে।

আমি তার দিকে এগিয়ে কাছে যেতেই মূর্তিটি বললে, 'খুব অবাক হয়ে গেছ, না?'

যেন রিন রিন করে উঠল তার কণ্ঠ। আমি বললাম, 'অবাক হবার মতো নয় কি ব্যাপারটা? কে তুমি?'

'আমার নাম বিয়েত্রিস। কিন্তু এটা আমার আসল নাম নয়। আপাতত এই নামটিতেই থাক আমার পরিচয়।'

তাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। কপাল অবধি ঢাকা তার চোখ হু'টি, নাক ও হু'টি গালের অংশমাত্র দেখা যাচ্ছে। তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে থাকিয়ে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলাম। এ কি আমাদের ট্রেণেরই এক সহযাত্রিনী, না কি সে এই অন্ধকারের কোনো বাসিন্দা? আসল পরিচয় দিতে তার এত আপত্তি কেন?

'তুমি নিশ্চয়ই ভারতীয়?' সে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। তার মানে তুমি জেনে শুনেই ডেকে আনলে আমাকে এখানে। কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না? নিজের সঠিক পরিচয় দিতে তোমার আপত্তি কেন? আর এই প্রান্তরের মাঝখানেই বা তুমি কিসের জন্যে আমাকে ডেকে এনেছ?'

'সেই কথা বলবো বলেই তো ডেকে এনেছি তোমাকে এখানে। আমি এই ট্রেণেরই যাত্রী। রটারডাম থেকে উঠেছি। জাহাজে ও রটারডামে পাসপোর্ট কাউন্টারে তোমাকে দেখেছিলাম আমি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছি কি না বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, তোমার মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা। তোমাকে তাই চিনতে পারছি না।'

সে হাসল, 'আমার পরিচয় জানতে ব্যস্ত হয়ো না। বলেছি তো, আমার নাম বিয়েত্রিস।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো বলছ এ তোমার আসল নাম নয়।

নিজের আসল নাম গোপন করছ! এই তুষার ঝরা অন্ধকার প্রান্তরে আমাকে ডেকে এনেছ! এ সব কি ব্যাপার? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার ব্যাপারে!'

'তুমি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ছ! আমাকে বলবার সুযোগই দিচ্ছ না তুমি। বলবো কি!'

'বেশ, বল।'

'তোমাকে একটা উপকার করতে হবে।'

'উপকার!'

'হ্যাঁ, উপকার। আমি বড় বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য চাইছি বন্ধু।'

'বন্ধু!'

একটু থেমে বললাম, 'কি ধরণের বিপদে পড়েছ তুমি? আর আমার দ্বারা তোমার উপকার হবে এই বা তুমি বুঝলে কেমন করে?'

'তুমি ভারতীয়। তাই জানি পরের উপকার করা তোমাদের একটা ধর্ম।'

'ভারতীয়দের সম্বন্ধে ভাল ধারণা দেখছি। কিন্তু আমি যে তোমার উপকার করবোই, এমন কথা তুমি ভাবলে কেমন করে?'

'আমি জানি তুমি উপকার করবেই বন্ধু।'

'বারবার বন্ধু বলে সম্বোধন করছো, কিন্তু বন্ধুজনোচিত ব্যবহার নয় তোমার। তুমি যদি আমার সহযাত্রিনীই হও তো, তোমার বিপদের কথা আমাকে ট্রেণেই জানাতে পারতে। পারতে না কি? এখানে এই ঠাণ্ডা আর বরফের মধ্যে ট্রেণের বাইরে মাঠের মধ্যে টেনে আনতে না!'

'না, পারতাম না সেখানে বলতে। আমার যা বক্তব্য, যে ধরণের বিপদ, তাতে তোমার কাছে সে কথা ট্রেণে কোথাও বলার সুবিধা ছিল না।'

'বেশ, তাহলে তাড়াতাড়ি বলে ফেল। এখানে ঠাণ্ডায় আর যে দাঁড়াতে পারছি না! তোমার কি শীত করছে না! এই তুষার কণাগুলি এসে তোমার মুখে চোখে বিঁধছে না তীরের মতো?'

'বিঁধছে, তবু উপায় ছিল না। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত, তবু নিরুপায় আমি।'

'যাই হোক বল, আমার দ্বারা কি উপকার আশা করো তুমি?'

'সামনেই একটা ষ্টেশন। আমার সঙ্গে আছে এমন জিনিস যা কাষ্টমস অথবা পুলিশের চোখে পড়লে আমার বিপদ ঘটবে। তাই আমি চাই তাদের হাত এড়াতে।'

'কি এমন জিনিস তোমার কাছে আছে, যা তুমি তাদের দেখাতে পারো না?'

'সে আমি বলতে পারবো না বন্ধু। আমার অনুরোধ, সে তুমি জানতে চেও না।'

"বাঃ, বেশ তুমি। আমাকে এখানে এনে কষ্ট দিতে তোমার বাধলো না, নিজের পরিচয় গোপন করে রাখলে, তোমার চেহারাটাও ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি জিনিস নিয়ে যাচ্ছ তাও তুমি বলবে না! এ দিকে আমার কাছে চাইছো উপকার!'

বিয়েত্রিস তার গ্লাভস পরা হাত দিয়ে আমার গ্লাভস পরা হাতখানি টেনে নিল।

'তোমার কাছে কোনো কথা গোপন না করতে পারলেই সুখী হতাম, কিন্তু উপায় নেই। তুমি আমার উপকার করতে পারবে না তাহলে?'

'কিন্তু আমি তোমার এই বিপদে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি, সেটাই তো বলছ না?'

'বিশেষ কিছুই তোমাকে করতে হবে না। আমার সঙ্গে যে জিনিসটি আছে সেটি তোমার ওভারকোটের পকেটেই ধরবে। শুধু তুমি নিয়ে যাবে এটি সঙ্গে করে। সামনের যে ষ্টেশন পড়বে সেই ষ্টেশন

পর্যন্তই তোমায় এটি সঙ্গে রাখতে হবে। সেই ষ্টেশন এলে একটি রোগা লম্বা চশমা পরা ওভারকোটের ল্যাপেলে ফুল গোঁজা একটি ছেলে এসে তোমার কাছে দাঁড়ালেই এটি তুমি তার হাতে তুলে দেবে। ব্যাস্, আর কিছু করতে হবে না।'

'যে জিনিস তুমি সঙ্গে রাখতে পারছ না কষ্টমস ও পুলিশের ভয়ে, সে জিনিস আমি রাখবো কেমন করে? আমাকে ধরা পড়তে হবে না?'

'ধরা তুমি পড়বে না। কারণ তারা তোমার লগেজ দেখবে না। কাজেই তোমার কোনো ভয়ের কারণ নেই। তারা জানে আমার কাছে ঐ জিনিস রয়েছে, তাই তারা আমার ওপর নজর রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে তারা আমাকে এ্যারেষ্ট করতে পারে।'

চম্‌কে উঠলাম। বললাম, 'সে কি! তাহলে তো তুমি বিপদ ডেকেই এনেছ এমনি করে বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে ডেকে এনে! তারা যদি তোমার ওপর নজর রেখে থাকে তো আমাকেও তারা এতক্ষণ তোমার সঙ্গে দেখতে পেয়েছে!'

বিয়েত্রিস হাসল। বললে, 'যে আমার ওপর নজর রেখেছে, সে এখন রিফ্রেশমেণ্ট-কারে বসে লোভনীয় খাদ্য পানীয় খাচ্ছে।'

বললাম, 'হুঁ, সবদিকেই লক্ষ্য আছে তোমার দেখছি।'

'তা না হলে বিপজ্জনক কাজ করতে পারবো কেন?'

'তুমি কি কোনো চোরাই কারবারী দলের অন্তর্ভূক্ত?'

'না।'

'তবে?'

একটুখানি চুপ করে রইল বিয়েত্রিস। তারপর বললে, 'তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। কারণ তোমার কাছে সব কিছুই গোপন করতে মন চাইছে না। উপকারী বন্ধুকে বিশ্বাস করতে পারি নিশ্চয়ই?'

'সে কথা তুমিই ভালো করে জানো। বিশ্বাস না করলে এত লোক থাকতে আমাকেই বা ডাকলে কেন?'

'তা আমি জানি।' তারপর এক মুহূর্ত থেকে সে বললে, 'আমার ভাই একটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। তার জন্যেই তাকে আমার সাহায্য করতে হচ্ছে। তার জন্যেই আমি তোমারও সাহায্য চাচ্ছি। সাহায্য করবে না আমায় ?'

এমন ভাবে সে কথাটি বিয়েত্রিস বলল, যে আমি কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিতে পারলাম না! তার সেই চোখের ওপর চোখ রেখে বললাম, 'কোথায় তোমার সেই জিনিস ?'

রেণ কোটের পকেটে হাত দিয়ে একটি ছোট প্যাকেট সে বের করে আমার হাতে দিল। ছোট হলেও বেশ ভারী। আমি সেটির দিকে একবার তাকিয়ে আমার ওভারকোটের পকেটে ফেলে দিলাম।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিয়েত্রিসের মুখ। দু'হাত দিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিল সে। বললে, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে বন্ধু!' এক মুহূর্ত থেমে তারপর বললে, 'কিন্তু এর বদলে কোন কিছু চাও না তুমি আমার কাছে—এই উপকার করার জন্যে ?'

'কি দিতে পারো তুমি আমাকে ?'

"যা চাও তুমি! সম্ভবপর হলে দেবো! বরফ কেটে পথ ঘাট পরিস্কার করে ট্রেন ছাড়তে এখনো দু'ঘণ্টার ওপর সময় যাবে। এর মধ্যে যা চাও দেবো।"

আমি একটু থেমে বললাম, 'আমি কিছুই চাই না। তাছাড়া কোনো কিছু নিয়ে উপকার করাকে উপকার করা বলে না।'

সে কোনো উত্তর দিল না, হয় তো একটু আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে।

বললাম, 'চল, এবার ফেরা যাক ট্রেণে।'

'এক সঙ্গে ফিরবো না আমরা। যদি তুমি কিছু মনে না করো তো আমি এগিয়ে যেতে চাই।'

'অর্থাৎ আমি যাতে এগিয়ে গিয়ে আড়াল থেকে তোমাকে চেনবার চেষ্টা না করি—তাই এ ব্যবস্থা!'

সে বললে, 'আমাকে ভুল বুঝো না।'

আমি উত্তর দিলাম না।

বিয়েত্রিস আমার হাত ধরে বললে, 'কিন্তু এমন করে আগে আগে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। তুমি আমার যে উপকার করলে সারা জীবনেও সে কথা ভুলবো না! আর ভুলবো না এই কথা যে, আমার উপকারী বন্ধুকে আমার কোনো পরিচয়ই দিতে পারলাম না।'

বললাম, 'তোমার এ দুঃখ-বোধকে আন্তরিক বলেই গ্রহণ করলাম। আমার পরিচয় তো কাস্টমস কাউন্টারে আমার পাশপোর্ট দেখেই পেয়ে গেছ!'

সে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে একটু হাসল। কিছু বলল না। তারপর আর পিছনে না ফিরে এগিয়ে গেল ট্রেণের দিকে।

আমি তার চলার পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেই শূন্য প্রান্তরে।

ট্রেণে ফিরে এসে করিডর দিয়ে যেতে যেতে প্রত্যেক কম্পার্টমেণ্টের ভিতরে মেয়েদের দেখতে দেখতে গেলাম। কোথায় সে? কে সে?

যে মেয়েকেই দেখলাম মনে হল সেই বুঝি! তাদের প্রত্যেকের চোখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে যাচাই করে দেখলাম চিনতে পারি কি না স্বল্প অন্ধকার প্রান্তরের সেই রহস্যময়ীকে! কোনো ভাবান্তর দেখতে পাই কি না পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়ে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না সে কে। এদের মধ্যে কোন্ মেয়েটির আজ উপকার করলাম এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে!

জীবনে আর কোনোদিনই তার দেখা পাবো না জানি। আর দেখা পেলেও আমি তাকে চিনতে পারবো না তাও জানি। কিন্তু সে তো আমাকে চিনতে পারবে! আকস্মাৎ কোনোদিন পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কি বলবে না, 'বন্ধু, আমিই সেই!'

ড্যুসেলডর্ফ সোনাটা

প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সে রাতে—

নভেম্বর মাসে এমন শীত জর্মনীতে অনেক বছর পড়েনি। রাইন নদীর পাড়ে ড্যুসেলডর্ফ শহরে বাস করে কয়েকদিনের শীতের আক্রমণে মনটা ভূমধ্যসাগর পার হয়ে প্রাচ্যদেশমুখো হবার জন্যে ছটফট করছিল!

শহরের উপকণ্ঠে লোয়ার রাইনের ওপর কাইজারওয়ার্থ ড্যুসেলডর্ফ-এর পল্লী অঞ্চল। সেখানে থাকতো আমার বন্ধু মানফ্রেড। সে রাতে তার বাড়ীতে আমাদের আড্ডা জমেছিল। সে একা থাকতো, রাতের খাবার সে আগেই বানিয়ে রেখেছিল, তাই আমি তার বাড়ী পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই খাবার পাট চুকিয়ে ফেলে আমরা বসেছিলাম সোফায় পায়ের ওপর কম্বল ঢেকে। ঘরের এক পাশে জ্বলছিল গ্যাসের চুল্লি, তার আগুনে ঘর বেশ গরম। ঘরের বাল্‌ব সন্ধ্যের দিকে ফিউজ হয়ে যাওয়ায়, বেড-ল্যাম্পের নীল ছোট বাল্‌ব জ্বলছিল, ঘরময় ছড়িয়ে ছিল মৃদু নীলাভ আলো; স্নিগ্ধ মধুর আমেজ তার। শীতের প্রকোপ বাদ দিলে পরিবেশ বেশ রহস্যময় দেখাচ্ছিল।

সেদিন শনিবার, ঠিক ছিল রাত কাটিয়ে পরদিন রবিবার বিকেল অবধি আমি মানফ্রেডের সঙ্গে থেকে ড্যুসেলডর্ফ-এ ফিরবো। শীতের আক্রমণে ইতিমধ্যেই শহরে যাতায়াতের জন্যে যানবাহন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল; পথ ঘাট বরফে জমাট। পথচারী নেই, দোকান রেস্তোরাঁ পাব সব বন্ধ। শুধু রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টগুলো সেই হিমপ্রবাহে যেন ধুঁকছে।

যেদিকে মানফ্রেডের বাড়ী, সেদিকে ঘর বাড়ীর সংখ্যা কম। বিস্তৃত খোলা প্রান্তর, ছাড়া ছাড়া দু'একটা করে বাড়ী। যুদ্ধ শেষ হয়েছে

ক'বছর আগে, জর্মনীর প্রায় শহর গ্রামে রয়ে গেছে ধ্বংসলীলার চিহ্ন। আজো অগণিত বিধ্বস্ত বাড়ী, কলকারখানার শেড চিমনী, রেল স্টেশন তার স্বাক্ষর বয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাইজারওয়ার্থেও এখানে ওখানে ধ্বংসস্তূপ ছড়ানো।

মানফ্রেডের বাড়ী এক সময়ে পাঁচতলা ম্যানসন ছিল, বোমার আঘাতে ওপরের দু'টি তলা মাটিতে নেমে যায় পাশে তৈরী বিশাল গহ্বরের মধ্যে। ভাঙা টুকরো ইঁট কাঠ ও বাঁকানো তোবড়ানো লোহার পাহাড় পথের আশেপাশে আজো খাড়া হয়ে আছে।

জর্মনীতে এসে অবধি নিজের চোখে এ সব দেখেছিলাম, লোকের মুখে শুনেছিলাম যুদ্ধের বহু ভয়াবহ ঘটনার কথা। আজ নতুন করে মানফ্রেডের মুখে সেই সব কথা শুনতে ভালোই লাগছিল। যুদ্ধের শেষ বৎসরগুলি তার প্রাক-যৌবনকাল; সেজন্যে সেদিনের স্মৃতি তার মনে অম্লান।

এই বাড়ীতেই মানফ্রেড থাকতো তার বাবা মা ও ছোট বোন মেরিয়েটার সঙ্গে। বাবা সৈন্যবাহিনীতে, মা ড্যুসেলডর্ফ-এর সামরিক হাসপাতালে নর্স। কিশোর মানফ্রেড ও মেরিয়েটা বাড়ীর অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে থাকতো। মাঝে মাঝে মা এসে দেখে যেতেন।

একদিন বাবা এলেন ফ্রন্টে যাবার আগে পরিবারের সঙ্গে মিলতে, মাও এসেছেন। মানফ্রেড ও মেরিয়েটা খুশীতে উজ্জ্বল। সেদিনই ড্যুসেলডর্ফ-এর আকাশ ঢেকে গেল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বোমারু বিমান আক্রমণে। কাইজারওয়ার্থও বাদ পড়লো না। মানফ্রেডদের বাড়ী ভাঙলো সেই আক্রমণে, বাড়ীর সঙ্গে তাদের পরিবারও। বাবা ও মা এক সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হলেন ভাঙা ইমারতের ধ্বংসস্তূপের নীচে। মানফ্রেড ও মেরিয়েটা ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ীর অন্য অংশে থাকায় প্রাণে বেঁচে গেল।

শুরু হল দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম, ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ঘোরা।

শহর থেকে অন্য শহরে মাটির বস্তার মতো চালান হওয়া। অনাহার, অর্ধাহার, রোগজীর্ণতা সারা দেশ জুড়ে ভাঙনের প্লাবন।

তারপর যুদ্ধ একদিন শেষ হল। নেহাৎ আয়ুর জোরেই মানফ্রেড ও মেরিয়েটা বেঁচে ছিল। ক্যাম্পে ক্যাম্পে শহরে গ্রামে পথে প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে তারা বড় হল। যুদ্ধোত্তর জীবনে এল একটা স্থিতি। নতুন করে বাঁচার আশ্বাস, প্রাণ খুলে কথা বলার, মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নেবার সময় শান্তির দিনে।

মানফ্রেড ও মেরিয়েটা বাল্য ও কৈশোর কাল পেবিয়ে উত্তীর্ণ হল যৌবনের প্রান্ত দেশে। সংগ্রাম ঠিকই চলল, তবে এ সংগ্রাম বাঁচার জন্যে রসদ সংগ্রহের সংগ্রাম।

এক বছর আগে মেরিয়েটা আক্রান্ত হল মানসিক রোগে। যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তার স্নায়বিক বিকার ঘটিয়েছিল। সেই নিয়ে সে বেঁচেছিল শেষ কয়েক মাস। মানফ্রডের সঙ্গে আমার পরিচয়ের আগে মেরিয়েটা আত্মহত্যা করে এই বাড়ীতেই দোতলা থেকে লাফ দিয়ে।

মেরিয়েটার কথা বলতে বলতে মানফ্রেডের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে সে বললে, "জানো শেখর, তুমি শুনলে হাসবে কি না জানি না, কারণ তোমাদের দেশ অধ্যাত্মবাদের দেশ, পরলোকতত্ত্ব পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। হয়তো আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে না। আমার খুব বিশ্বাস মেরিয়েটা অসুস্থতার জন্যে কিম্বা ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করেছিল বলে তার আত্মা আজো শান্তি পাচ্ছে না। কারণ আজো প্রায় রাতেই আমি এই ঘরের মধ্যে কার যেন চলাফেরার মৃদু শব্দ শুনতে পাই, ক্ষীণ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি। মনে হয় মেরিয়েটার প্রেতাত্মা এখানে আসে। তার অভিশপ্ত আত্মা এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যেতে পারছে না।"

আমি অবাক হয়ে মানফ্রেডের কথা শুনছিলাম। সে থামতে বললাম, "দেখ, তুমি বিজ্ঞানের জর্মন ছাত্র হয়ে যে কথা বিশ্বাস করো,

আমি সাহিত্যের ভারতীয় ছাত্র হয়ে সে কথা অবিশ্বাস করি কেমন করে! বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উৎপত্তি, অবিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানের।"

কথায় কথায় রাত গড়িয়ে চলল, আলাপের ফাঁকে ফাঁকে দু'জনের চোখই তন্দ্রায় বুজে আসছিল, বাক্যালাপে সাময়িক বিরতি ঘটছিল।

এক সময়ে দরজায় করাঘাত শুনে বিস্মিত হয়ে মানফ্রেড উঠে দরজা খুলল। দেখলাম একটি জর্মন যুবক দাঁড়িয়ে মানফ্রেডের সঙ্গে নিম্নস্বরে কি যেন বলল, তারপর চলে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার মানফ্রেড?"

সে বললে, "হানার জ্বর সন্ধ্যে থেকে আরো বেড়েছে। তার ভাই খবর দিয়ে গেল।"

হানা মানফ্রেডের বাগদত্তা; ক'দিন থেকে সে অসুস্থ জানতাম।

জিগ্যেস করলাম, "তুমি এখন তাকে একবার দেখতে যাবে না?"

"বিকেলে তো দেখে এসেছি।"

"তাতে কি হয়েছে! তার ভাই যখন এ সময়ে এসে খবর দিয়ে গেল, তখন তার অসুখের বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই হয়েছে। তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।"

মানফ্রেড ভাবতে লাগল।

"আমার জন্যে ভাবছো?"

"তুমি আছ, আমি চলে যাবো, সে কি হয়!"

"খুব হয়। তুমি দ্বিধা করো না মানফ্রেড। তার অসুখের বাড়াবাড়ির খবর পাবার পরও যদি তুমি তার কাছে না যাও সেটা অন্যায় হবে অনেক বেশি। আমারও খুব খারাপ লাগবে ভেবে যে তুমি আমার জন্যেই গেলে না।"

অগত্যা মানফ্রেড উঠে পড়ল, বললে, "খুব খারাপ লাগছে তোমাকে একা রেখে যেতে।"

"তোমার চিন্তা নেই। আমি আরামে রাত কাটাতে পারবো। যদি দরকার হয় রাতটা হানার কাছেই থেকো।"

মানফ্রেড টপ কোট টুপী গ্লাভ্‌স পরে বেরিয়ে গেল, যাবার সময়ে বললে, "আমি একটু পরে ফিরে আসবো।"

"তাহলে আমি খুব দুঃখ পাবো জেনো।"

মানফ্রেড চলে যাবার পর ঘড়ির দিকে তাকালাম। তখনো ন'টা বাজে নি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মধ্যরাত্রি। এত সকালে ঘুমানোর অভ্যেস নেই, সেজন্যে টেবিলের ওপর থেকে একটা পত্রিকা টেনে সোফায় বসে পড়লাম।

হঠাৎ মেরিয়েটার কথা মনে পড়ল। মানফ্রেড বলেছিল তার অভিশপ্ত প্রেতাত্মা আজো এই ঘরে ঘুরে বেড়ায়। একা সেই ঘরে বসে নিস্তব্ধ নির্জন দুর্যোগপূর্ণ রাতে বুক কেঁপে উঠল। পরলোকতত্ত্বে আমি বিশ্বাসী ; কোনো সংস্কারবশে নয়, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। সেজন্যে মানফ্রেডের অনুমানকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সন্ত্রস্তভাবে ঘরের চারিদিকে তাকালাম। কান খাড়া করে রইলাম কোনো শব্দ শোনা যায় কি না। প্রেতাত্মার আবির্ভাবের সম্ভাবনার কথা ভেবে সেই প্রচণ্ড শীতেও ঘেমে উঠলাম।

মনে হল মানফ্রেডকে জোর করে না পাঠালেই হতো! আমি অপরিচিত ভিন দেশী মানুষ। এই ঘরে রাত কাটাচ্ছি একাকী। সত্যি সত্যি যদি মেরিয়েটার প্রেতাত্মা আসে, আমি কি পারবো তার উপস্থিতি যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে সহ্য করতে! মানফ্রেড কি এই কথা ভেবেই আমাকে একা রেখে যেতে চায়নি! সে তার ভাই, তার কোনো ক্ষতি সে করবে না, কিন্তু আমি তো অপরিচিত বিদেশী আগন্তুক তার কাছে!

ম্যাগাজিনটা টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে দেখি ঘরের কোণে যে অংশটা পর্দায় ঢাকা, সেই পর্দা নড়ে উঠল। আপনা থেকে সমস্ত

শরীর কেঁপে গেল, দেহের রোমকূপ সব খাড়া হয়ে উঠল। "কে ওখানে ?" বলে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

আবার পর্দা নড়ল, তারপর আচমকা যেটি আমার সোফার পাশ দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল দরজার দিকে, সে একটি কালো বিড়াল।

কালো বিড়াল ওদেশে সুখ সৌভাগ্যের প্রতীক, আমার জন্যে কি না বুঝতে পারলাম না। সে এতক্ষণ ছিল কোথায় ? সারা সন্ধ্যে তো তাকে দেখি নি! পর্দার ওপাশে একফালি জায়গা, সেখানে মেরিয়েটার পিয়ানো ও ওয়ার্ডরোব রাখা। ওদিকে কোনো দরজা জানালা নেই যে বিড়াল সেদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকবে!

মন আশংকায় পূর্ণ হয়ে গেল। ঘরের নীলাভ আলো আমার দেহ মনকে অবশ করে তুলল।

উঠে পড়লাম, পিছনে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর্দা সরিয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। আকাশ নিঃসীম অন্ধকার, মিটমিট করে জ্বলছে তারাগুলি। নীচে জনমানবহীন পথঘাট. দূরে রাস্তার কুকুরের চিৎকার। ঘরে বাইরে রোমাঞ্চকর পরিবেশ।

ঘুম পাচ্ছিল না; ডিভানের ওপর শুয়ে পড়লাম, চোখ কান তেমনি সজাগ। কম্বলটা পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে নিলাম, চোখ রইল সেই পর্দার দিকে। আতঙ্কজনক পরিবেশে অস্থির মনে ভয়ের আবেশে ঘুমোবার চিন্তা ত্যাগ করলাম। ম্যাগাজিন উল্টিয়ে বারবার পড়েও মনকে বশ মানাতে পারলাম না। তখন মনে হল একটা কিছু লিখি! একটা গল্প! এই রকম রহস্যময় পরিবেশে মানসিক ভারসাম্য হারানোর চেয়ে লেখার মধ্যে মনকে ব্যাপৃত রাখলে তবু হয়তো সময়টা কেটে যাবে! মনটাও স্থির থাকবে!

মানফ্রেডের রাইটিং প্যাড টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে লিখতে বসলাম। এই রকম পরিবেশে মেরিয়েটার প্রেতাত্মার অস্তিত্বে মানফ্রেডের বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটা গল্প লিখবো! ভৌতিক গল্প!

*   *   *

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মৃত্থ শব্দে, দরজায় আওয়াজ হল। মানফ্রেড ফিরে এসেছে মনে করে উঠে দরজা খুললাম। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একটি নারী মূর্তি। মাথায় স্কার্ফ, গায়ে টপ-কোট, হাতে গ্লাভস, টপ কোটের নীচে নাইলনের মোজায় ঢাকা সুডৌল দুটি পা ও জুতো।

কিন্তু তার সৌন্দর্য বা সাজ দেখার মতো মনের অবস্থা তখন নয়। তাকে দেখেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম সে মেরিয়েটার প্রেতাত্মা। আজ একেবারে মনুষ্যমূর্তি ধারণ করে এসেছে। তাকে দেখবামাত্র সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেছিল, সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর এক ঝটকায় দরজা থেকে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম সোফার পিছনে। পা দুটির ওপর দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠল!

আমাকে ও ভাবে সরে গিয়ে দূরে দাঁড়াতে দেখে সে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছিল। কয়েক মুহূর্ত সে নির্বাক নিশ্চল হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখল। তারপর মৃত্থকণ্ঠে বললে, "মানফ্রেড এখানে থাকে না?"

তাকে দেখে ভয় পেলেও আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলাম, "মানফ্রেড এখানেই থাকে। উপস্থিত সে বাইরে গেছে।"

মানফ্রেডের কথা যখন সে জিজ্ঞেস করলো তখন সে মেরিয়েটা না হয়ে যায় না। আর কিছু বলতে পারলাম না, আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে বললে, "আর মেরিয়েটা? মেরিয়েটা কোথায়?"

তার প্রশ্নে এবার বিস্মিত হলাম। সে কি তবে মেরিয়েটা নয়? সে কি অন্য কেউ? না, মৃত্যুর আগে তার যে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল তার ফলে সে নিজের নাম ভুলে গেছে!

অতি কষ্টে জবাব দিলাম, "মেরিয়েটা ছ'মাস আগে মারা গেছে। ঠিক মারা যায় নি, আত্মহত্যা করেছে।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম আমার কথার কি প্রতিক্রিয়া তার মুখে হয় দেখার জন্যে। দেখলাম তীব্র বেদনার ছায়া তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। সে ক্ষণিকের জন্যে। বললে, "আত্মহত্যা করল কেন, জানো?" কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। সোজা দাঁড়াতে পারছিল না সে।

"ওয়ার নিউরসিসে ভুগছিল সে। স্নায়বিক বিকারই তার আত্মহত্যার কারণ।"

মনে হল তার সঙ্গে তো বেশ কথা বলতে পারছি। তাকে প্রথম দেখে যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল, সে ভাব একটু যেন কম। একি তবে কোনো প্রেতাত্মা নয়! আমাদের মতোই মানুষ!

সে এবার একটু এগিয়ে এল, বললে, "মানফ্রেড কখন ফিরবে?"

বললাম, "সে তার বাগদত্তা হানার বাড়ী গেছে, তার অসুখ। ফিরবে না আজ রাতে।"

সে আরো এগিয়ে এল, আমি কাঠের মত দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সন্দেহের দোলায় দুলছে মন। প্রেতাত্মা, না রক্ত মাংসের মানুষ! কে সে!

সে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার নাম রুথ হারমান। মেরিয়েটা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কয়েক বছর হল আমি এ্যামেরিকার বাস করছি। কিছুকাল আগে এসেছি কয়েক দিনের জন্যে। কাল সকালের প্লেনেই লণ্ডন হয়ে নিউয়র্কে ফিরে যাবো। ড্যুসেলডর্ফ-এই আমার বাড়ী। মেরিয়েটার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সন্ধ্যের সময়ে এক বন্ধুর গাড়ী চেয়ে নিয়ে এখানে আসবো বলে রওনা হয়েছিলাম। পথে—"

রুথ থেমে গেল। তার স্বাভাবিক কথা বলার ধরণে আশ্বস্ত হয়েছিলাম, আতঙ্কর ভাবও কেটে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, "পথে কি হল? দেরি হয়ে গেল মাঝপথে গাড়ী আটকিয়ে পড়ে?"

রুথ মৃদু কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ।" একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন শুনতে পেলাম।

সে বললে, "তুমি কে? মানফ্রেডের অতিথি?"

"তার বন্ধু। নাম শেখর সেন। ভারতীয়, সেটা দেখেই বুঝতে পারছো। ড্যুসেলডর্ফে মানফ্রেড ও আমি একই আপিসে কাজ করি।"

সে যে মেরিয়েটা নয় সে বিষয়ে ততক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। মেরিয়েটার ছবি ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা আছে, তার চেহারার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

বেশ সহজ হয়ে গেলাম, আতঙ্কের ভাব একেবারেই কেটে গেল। সে যে আমাদের মতোই একজন মানুষ এবং তার নাম রুথ হারমান— এ কথা বিশ্বাস হল। বললাম, "দাঁড়িয়ে কেন? বস।"

সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

হেসে বললাম, "ভয় নেই, আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো। আমি পুরুষ পরে, মানুষ আগে।"

আমার কথায় তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল।

সে বললে, "তুমি পুরুষ এবং মানুষ, আমি জানি। কিন্তু আমি মেয়ে হলেও মানুষ নই, এ কথা তুমি জানো না।"

আমি তার রসিকতায় হাসলাম। বললাম, "তুমি যাই হও তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি যে অতি রূপসী, সে কথা তোমার ঐ অতিকায় টপ কোট বা স্কার্ফে অর্ধেক ঢাকা ধোঁয়াচ্ছন্ন মুখ থেকেও বোঝা যাচ্ছে।"

সে কিছু বলল না। মনে হল সে যেন হাঁপাচ্ছে। অনেক কষ্টে শরীরটাকে সে সোজা দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

পর্দা ঢাকা কোণে গিয়ে সে দাঁড়াল, পর্দা সরিয়ে পিয়ানো দেখে বললে, "মেরিয়েটা ও আমি এই পিয়ানো কত বাজিয়েছি!"

বললাম, "আজও বাজাও না। মানফ্রেড কিছুদিন আগে ওটা ট্যুনিং করে এনেছে।"

রুথ পিয়ানোর ঢাকনা খুলে দিল। একটা হাতের আঙুলগুলি রীডগুলোর ওপর দিয়ে চলে গেল, টুং টুং করে বেজে উঠল পিয়ানো।

বললাম, "মানফ্রেড আজ ফিরছে না। তোমার পক্ষেও এই রাতে যানবাহনের অভাবে ড্যুসেলডর্ফ-এ ফেরা সম্ভব নয়। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। আমারও ঘুম হবে না। তুমিও শোবে বলে মনে হয় না। কাজেই তুমি যদি সারা রাত পিয়ানো বাজাও, আনন্দেই সময় কেটে যাবে।"

রুথ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল পিয়ানোর ওপর হাত রেখে।

বললাম, "আজকের রাত বড় বিচিত্র! তাই না?"

"ঠিক তাই!" সে আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই শূন্য ঘরে একাকী বসে মেরিয়েটার প্রেতাত্মার আবির্ভাবের উৎকণ্ঠায় কেটে ছিল, এখন একজন রূপসী যুবতীর সঙ্গে সময় কাটানোর রোমাঞ্চকর আনন্দে মন ভরপুর! এখন মনে হচ্ছে সেই কালো বিড়ালটা আমার পক্ষেও সুখের সৌভাগ্যের প্রতীক!

"কি হল, পিয়ানো বাজাবে না?"

সে আমার দিকে তাকাল এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর সেই টপকোটে মাথায় স্কার্ফ বাঁধা অবস্থাতেই সামনের টুলে বসে পড়ল, হাতের গ্লাভস পরেই পিয়ানো বাজাতে লাগল।

আমি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম সোফায়। পায়ের ওপর কম্বল টেনে নিলাম। হঠাৎ দেখি সেই কালো বিড়ালটা কোথা থেকে লাফিয়ে এসে আমার কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে 'কেঁউ' 'কেঁউ' করে উঠল।

এবার আর তাকে দেখে ভয় হল না। তাকে কম্বলের মধ্যে ঢেকে নিলাম। দেখলাম সে থরথর করে কাঁপছে, বোধহয় শীতে!

ও দিকে তখন শুবার্টের সোনাটা বাজছে। রীডগুলোর ওপর দিয়ে রুথের আঙুলগুলি নেচে নেচে চলল, এত দ্রুত যে হাতই দেখা যাচ্ছে না।

শুবার্টের পর মোৎসার্ট, তারপর বেটোফেন। একে একে অবিস্মরণীয় সুরস্রষ্টাদের সুরগুলি যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেই নীলাভ স্নিগ্ধ মায়ায় ভরা রাতকে আনন্দমুখর করে তুলল। অতীন্দ্রিয় লোকের এক অনির্বচনীয় সুষমা যেন সেই ঘরের মৃদু আলোকে চার দেয়ালের আনাচে কানাচে গলে গলে পড়তে লাগল! এক অনাস্বাদিতপূর্ব সুরের মায়ায় আমি ধীরে ধীরে মোহগ্রস্ত হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

সেই সুরের প্রবাহে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কোলে শোওয়া বিড়ালটা 'কেঁউ' 'কেঁউ' করে উঠতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের চোখে হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত সাড়ে তিনটে। সঙ্গীতের তরঙ্গ তখনো বেজে চলেছে, সুরের দাপাদাপি যন্ত্রের বুকে। চোখ মেলে পিয়ানোর দিকে তাকালাম।

এ কি!

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে দেখলাম, পিয়ানোর সামনে টুলে কেউ বসে নেই। কারো হাতে সে পিয়ানো বাজচ্ছে না, রীডগুলো নেচে নেচে চলছে, উঠছে নামছে রীডের স্পাইকগুলি আপনা থেকেই। অদৃশ্য হাতে বাজছে সেই যন্ত্র!

* * *

এই পর্যন্ত লিখে কলম নামিয়ে রাখলাম। সারা রাত ধরে একটানা একটা গল্প লেখা আমার জীবনে বোধ হয় এই প্রথম! বিশেষ করে এই রকম একটা অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশে! গল্পটা এই পরিবেশেরই উপযুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই! নিজের লেখা কখনোই একবার লিখে পছন্দ হয় না, একটা গল্প সম্পূর্ণ মনের মতো করে লিখতে এক বছরও লেগে যায়! গল্পের নাম থেকে শুরু করে সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায়! অথচ এই গল্পের নাম 'ড্যুসেলডর্ফ সোনাটা' থেকে শেষ লাইন অবধি বেশ পছন্দ হল কয়েকবার পড়ার পরেও! গল্পটা উতরে গেছে সন্দেহ নেই। প্রেতাত্মা সম্পর্কে ভয়ে আতঙ্কেই বোধ হয়!

হাত ঘড়িতে ভোর চারটে বাজে—মানফ্রেড কখন আসবে জানি না। হয়তো বেলা হবে ফিরে আসতে। হানার ওখানেই আটকে পড়েছে! হয়তো তার অসুখের বাড়াবাড়ি চলছে।

লেখার কাগজগুলি টেবিলের ওপরে রেখে সাজিয়ে পেপার ওয়েটের তলায় চাপা দিয়ে ডিভানে শুয়ে পড়লাম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল, রাত জাগার ফলে সারা শরীরে অবসাদ, স্নায়ুগুলি নিস্তেজ হয়ে আসছে!

ঘুম ভাঙল মানফ্রেডের ডাকে।

উঠে বসলাম, তখনো চোখ দু'টি ভাল করে খুলতে পারছি না। হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম, চারটে! বিকেল চারটে!

হাই তুলে বললাম, "কখন ফিরলে মানফ্রেড?"

"একটু আগে। সারা দিনই ঘুমিয়েছ মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, তাই হবে! হানা কেমন আছে?"

"ভাল। ডাক্তার বলেছেন বিপদ কেটে গেছে।"

"সুখবর।"

"একদিকে! অন্যদিকে একটা দুঃখের খবরও আছে।" মানফ্রেডের কথা শুনে তার ম্লান মুখের দিকে তাকালাম।

"আমি ভোর বেলাতেই হানাদের বাড়ি থেকে ফিরেছিলাম। এসে দেখি তুমি গভীর ভাবে ঘুমে আচ্ছন্ন। তোমাকে তুললাম না। আমারও ঘুম পাচ্ছিল। শোবার তোড়জোড় করছি এক কাপ কফি খেয়ে, হঠাৎ নীচের দোকানদার এসে খবর দিল আমার টেলিফোন এসেছে।"

আমি নীরবে শুনছিলাম, তখনো ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি আমার।

মানফ্রেড বললে, "মেরিয়েটার এক বাল্য বন্ধু ছিল। ড্যুসেলডর্ফেই থাকতো সে। যুদ্ধের পর তার মার সঙ্গে স্টেট্স্-এ চলে যায়।

ছেলেবেলা থেকেই সে খুব প্রতিভাময়ী ছিল, পিয়ানো বাজাতে পারতো আট বছর বয়স থেকেই নিজে নিজে। স্টেট্‌স্‌-এ বড় হয়ে পেশা হিসাবে পিয়ানিস্ট হয়েছিল সে, নামও করেছিল। বহুকাল বাদে সে এসেছিল সম্প্রতি দেশে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বহু বছর। মেরিয়েটার মৃত্যুর খবরও জানতো না। সে গতকাল ড্যুসেলডর্ফ থেকে একা মোটরে করে এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময়ে পথে—”

আমার তন্দ্রা ছুটে গেছিল মানফ্রেডের কথা শুনতে শুনতে। চোখের সামনে তখন গত রাত্রির দৃশ্যগুলি পুনরভিনীত হচ্ছিল যেন ছায়াছবির মতো! আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলাম মানফ্রেডের কথা! হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—“আসার সময়ে পথে মোটর তুর্ঘটনায় সে মারা গেছে! তাই না মানফ্রেড? তার নাম রুথ হারমান! আমি জানি! আমি জানি মানফ্রেড!”

মানফ্রেড উঠে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, “শেখর, এ সব কি বলছো তুমি? তুমি কি করে জানলে এ খবর? কি করে জানলে তার নাম? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তুমি—তুমি—”

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। কোনো কথা বলার মতো অবস্থা তখন নয় যেন আমার! আমার চোখ তুটি তখন আটকে গেছে টেবিলের ওপরে রাখা আমার গল্পের উপরে! ওটা কি আমার লেখা! না, অন্য কারো! না কি, সম্পূর্ণ একটা অদৃশ্য-শক্তি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে রেখে গেছে গল্পটি!

আমাকে নিরুত্তর ও মুহ্যমান দেখে মানফ্রেড বলে উঠল, “শেখর! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি প্রকৃতিস্থ? সুস্থ আছ?”

মানফ্রেডের কোনো কথা আমার কানে ঢুকল না। আমার কানে বাজছে কয়েকটা সংলাপের টুকরো, পিয়ানোর বুকে তোলা অতীন্দ্রিয়

লোকের সুরের মূর্ছনা আর প্রায় অস্পষ্ট ধোঁয়াটে একটা অবয়ব! তারই সম্পূর্ণ একটি ছবি!

ফ্যাল ফ্যাল করে বোবার মতো তাকিয়ে থাকলাম সেই পিয়ানোর দিকে। যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম রীডগুলোর ওপর দিয়ে দুটো হাতের দশটি লম্বা সরু আঙুল নেচে নেচে চলেছে! কানে বাজছে সুরের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে, ঢেউ-এর পরে ঢেউ-এর মেলা! বেটোফেনের 'মুন লাইট' সোনাটার মতো, শপ্যাঁর 'রেন ড্রপ' সোনাটার মতো, বাজছে রুথ হারমানের 'ড্যুসেলডর্ফ' সোনাটা!

সুইস নায়িকা

সুইটজারল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছি। বার্ণ, লুসার্ণ, মনট্রো, ইন্টারলাকেন ও য়ুংফ্রাউ ঘুরে পৌঁছলাম জেনিভায়।

অবশ্য সুইটজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করেই একবার জেনিভা ঘুরে গেছি, সে শুধু একদিনের জন্যে। সে সময়ে কাজ ছিল বার্ণে, তাই প্রকাণ্ড শহর জেনিভা ভাল করে না দেখেই চলে গেছিলাম। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে আবার এখানে তাই আসা।

সারা দেশটাই নয়নাভিরাম দৃশ্য দ্বারা মুগ্ধ করে রেখেছিল আমাকে! এমন সুন্দর ছবির মতো দেশ এর আগে দেখিনি কখনো। প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকে, যেগুলি সৌন্দর্য পিপাসু মনকে টানে দেশ বিদেশ থেকে। সুইটজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের যেন শেষ নেই। পাহাড় পর্বত, হ্রদ, সবুজ প্রান্তর, তুষার, পথ ঘাট সব যেন কোনো নিপুণ শিল্পীর আঁকা ছবি। প্রকৃতি যা দিয়েছে এ দেশকে, মানুষও তাকে কাজে লাগিয়েছে, বাড়িয়েছে সে সম্পদ, সৌন্দর্য রচিত রঙে বর্ণে বৈচিত্র্যে।

জেনিভা হ্রদের ধারে একটি বেঞ্চিতে বসেছিলাম একাকী। হ্রদের বুকে বাহিত ষ্টীম লঞ্চ, য়াচ্ ও নৌকোর মেলা। প্রত্যেকটি ভ্রমনার্থীতে পূর্ণ। এই সময়টা গ্রীষ্ম কাল, তাই দুটি হাত ও দুটি পা মেলে সব শ্রেণীর ছেলে বুড়ো নরনারী পথে নেমেছে। এদের আনন্দ উপভোগে, খুশীর প্রাবল্যে ঝলমল করছে চারদিক। আকাশেও নানা রঙের সমারোহ মানুষের মনের রঙের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

চুপ করে দেখছিলাম, উপভোগ করছিলাম দৃশ্যগুলি। এখানে আমি ভ্রমণার্থী। যে হোটেলে উঠেছি, সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে যা কিছু পরিচয়, তারা দল বেঁধে ঘুরছে, আর কারো সঙ্গে পরিচয় না থাকায় আমি প্রায় নিঃসঙ্গ।

একটি লোক এসে বসল বেঞ্চে আমার পাশে। তার দিকে তাকাতে দেখলাম সে হাসল।

সৌজন্যমূলক হাসি আমিও হাসলাম। বিদেশে বিভূঁয়ে অনেকেই ভারতীয় দেখে এগিয়ে আসে, আলাপ পরিচয় করে, ভারতবর্ষের খবর জানতে চায়। এও তেমনি হবে হয় তো, তাই হাসির দ্বারা পরিচয়ের সূচনা করল।

সে বললে, 'তুমি ভারতীয় ?'

'হ্যাঁ।'

'ভারতবর্ষ থেকে আসছ ?'

'আমি লণ্ডনে থাকি, সেখান থেকেই এসেছি এখানে বেড়াতে।'

'ও। লণ্ডনে কি করো। ছাত্র ?'

বললাম, 'হ্যাঁ। ছাত্র।'

সে বললে, 'খুব খুশী হলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করে। ভারতীয়দের আমার খুব ভাল লাগে।'

'তাই না কি ?' আমি হাসলাম।

সে বললে, 'এখানে কয়েকজন ভারতীয় আছে, চাকরী করে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশানে আর আছে য়ুনাইটেড নেসন্স আপিসে।'

'আমিও শুনেছি বটে।'

'তুমি একাই এসেছ ? না, আরো কেউ সঙ্গী আছে ?'

'আমি একাই।'

'একা একা কি দেশ বেড়ানো হয় ?' সে হাসল, বললে, 'সঙ্গী না থাকলে ভ্রমণের সুখ নেই।'

বললাম, 'তা সত্যি। মাঝে মাঝে ভীষণ খারাপ লাগে বৈ কি !'

সে বললে, 'এখানে তোমার পরিচিত কেউ নেই ?'

'না।'

'তাহলে খুবই খারাপ লাগছে বল !'

'সে বিষয়ে সন্দেহ কি !' আমি আবার হাসলাম।

সে বললে, 'আমার নাম এ্যডল্‌ফ্‌ লিখটার।'

'আমি হেসে বললাম, 'এডল্‌ফ্‌ হিটলারের আত্মীয় নও তো?'

সে হাসতে লাগল, বললে, 'হলে মন্দ হত না!'

আমি কিছু না বলেই হাসলাম, তারপর বললাম আমার নাম।

সে বললে 'এখানে কোথায় উঠেছ?'

হোটেলের নাম বললাম।

সে বললে, 'কতদিন থাকবে?'

'আর দু'দিন।

'তারপর?'

'তারপর প্যারিস হয়ে লণ্ডনে ফিরবো।'

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল হ্রদের বুকে। আমাদের গল্প জমে উঠল। সুইটজারল্যাণ্ডে গত পনেরো দিন ধরে নানা জায়গায় গেছি—একমাত্র বার্ণে ই কথা বলার ও সময় কাটানোর ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গী পেয়েছিলাম। বাকী ভ্রমণ গেছে প্রায় নিঃসঙ্গ। ট্রেণের ষ্টীমারের কর্মচারী, কুলি, হোটেলের লোকজন বড় জোর পথ ঘাট খুঁজে পাবার জন্যে বা কেনা কাটা করার জন্যে দু'চারটে কথা হয়েছে নয় তো মৌনই থাকতে হয়েছে বেশীর ভাগ সময়ে। সে জন্যে এডল্‌ফ লিখ্‌টারের গায়ে পড়ে আলাপ খারাপ লাগছিল না। বরং নিঃসঙ্গতা সে দূর করে দিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে।

কথায় কথায় আটটা বেজে গেল। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই বললাম, 'অনেক রাত হল। এবার উঠবো।'

এডল্‌ফ বললে, 'হোটেলে ফিরবে?'

'হ্যাঁ।'

'তার চেয়ে চল না আমার বাড়া। কাছেই। সেখানে যা হয় কিছু খাওয়া যাবে। আমার স্ত্রী আছে, তার সঙ্গেও আলাপ করবে ভারতীয়দের খুব পছন্দ তার।'

তার প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। হোটেলে সেই তো একা একা বসে খাওয়া—তারপর লাউঞ্জে চুপ করে বসে ম্যাগাজিন ওলটানো নয় তো রেডিও শোনা। তার চেয়ে এ্যাডল্‌ফের সঙ্গে যাওয়া ও তার সঙ্গ অনেক বেশী কাম্য মনে হল।

তবে সংকোচ হল। সামান্য আলাপ। এত অল্প আলাপে তার বাড়ীতে যাওয়া উচিত হবে না। সে না হয় ভদ্রতার খাতিরে নিমন্ত্রণ করল। আমার কি উচিত হবে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা!

কিন্তু সংকোচ দূর করে দিল সে। বললে, 'তুমি আমাদের দেশের অতিথি। যে দেশে বেড়াতে এসেছ সে দেশের লোকজনকেও তো দেখবে, জানবে! আমার বাড়ী যেতে এত সংকোচ কেন? অবশ্য অন্য কোনো আপত্তি থাকলে আলাদা কথা।'

এরপর আপত্তির কথা ওঠে না। বললাম, 'তোমার স্ত্রী খুব বিব্রত হয়ে পড়বেন আমার মতন একজন বিদেশীকে হঠাৎ বিনা নোটীশে রাস্তা থেকে ধরে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে। তাছাড়া এ রকম ভাবে হঠাৎ গিয়ে পড়লে তাঁর অসুবিধাও হতে পারে।'

'কিছু মাত্র না। আমার বাড়ীতে রোজই কেউ না কেউ আসেই। খাবার দাবার সে জন্যে মজুত থাকে সর্বদা। বিশেষ, রাতের খাবার আমার স্ত্রী বেশী করে তৈরী রাখে।'

এরপর আর কিছু বলতে পারলাম না। তার সঙ্গে যাবার জন্যে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়লাম।

কয়েকটি রাস্তা ও মোড় পার হয়ে সে আমাকে নিয়ে একটি বাড়ীর সামনে উপস্থিত হল। তিন তলা বাড়ী।

বললে, 'এরই দোতালায় আমি থাকি। চল ওপরে।'

বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখলাম এক পাশ দিয়ে একটি সিঁড়ি উঠে গেছে। আমি এ্যাডল্‌ফের সঙ্গে দোতালায় একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

পকেট থেকে ল্যাচ কী বার করে দরজা খুলল। সামনেই একটি লাউঞ্জ। আসবাবপত্র বেশী নেই, কিন্তু সবই সুরুচিপূর্ণ।

ঘরের এক কোণে ফ্লোরল্যাম্প জ্বলছিল, তারই আলোয় ঘরটি স্বল্পালোকিত।

এ্যাডল্‌ফ বললে, 'তুমি বস। আমি দেখি আমার স্ত্রী কোথায় আছে।' আমি বসলাম না। একটি প্রকাণ্ড আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আলমারির একদিকে কাঠ, অপর পাশে বিরাট লম্বা আয়না।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখছিলাম, হঠাৎ চোখ পড়ল আমার প্রতিবিম্বর পাশেই আর একটি প্রতিবিম্ব। আশ্চর্য সুন্দরী এক নারী।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটি যুবতী। রক্তাভ চুল, নিখুঁত মুখ চোখ, ঠোঁট চিবুক, উদ্ধত বুক।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। হঠাৎ শুনলাম এ্যাডল্‌ফের গলা, 'এই আমার স্ত্রী ব্রিজিট। আমার ভারতীয় বন্ধু মিঃ সেন।'

মাথা নীচু করে 'নড্‌' করলাম। ব্রিজিট হেসে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে।

তার প্রসারিত হাত ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে বিদ্যুতের মতন শিহরণ বয়ে গেল।

'বস।' সুরেলা গলায় ব্রিজিট বললে।

আমি তার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়েছিলাম। তার কথায় চমক ভাঙল, পাশের সোফায় বসলাম।

এ্যাডল্‌ফ্‌ বললে, 'ব্রিজিট, এর আতিথেয়তার ভার তোমার ওপর। দেখো, যেন ত্রুটি না হয়।'

আমি সসংকোচে বললাম, 'তোমরা মিথ্যে বাড়াবাড়ি করছ। আমি এসে বরং তোমাদের অসুবিধায় ফেললাম।'

'কিছুমাত্র না,' এ্যাডল্‌ফ্‌ বললে, 'আমরা অতিথি আপ্যায়নে অভ্যস্ত, বিশেষ করে ব্রিজিট খুব ভালবাসে বিদেশীদের। অনেক টুরিষ্টেরই আমার বাড়ীতে পদার্পণ ঘটেছে।'

আমি হেসে বললাম, 'তোমরা খুব অতিথিপরায়ণ দেখছি।'

'তা বলতে পারো', এ্যাডলফ্‌ বললে। তারপর একটু থেমে ব্রিজিটের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কফির ব্যবস্থা করো আগে, তারপর ডিনার।' আমার দিকে চেয়ে বললে, 'কফি চলবে তো?'

'মিথ্যে কেন কষ্ট করবে?' আমি বললাম, 'আমার হোটেলে রাত দশটার সময়ে গেলেও খাবার পাবো। বরং কফি খেতে পারি, কিন্তু ডিনারের দরকার নেই।'

'সে কি হয়', এ্যাডল্‌ফ্‌ বললে, 'আমি নিমন্ত্রণ করলাম!'

ব্রিজিট বললে, 'তুমি ডিনার খেয়েই যাবে।'

আমি আর কিছু না বলে হাসলাম।

ব্রিজিটের রূপের চটকে তার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছিলাম না।

ব্রিজিট আমাকে তার দিকে একদৃষ্টে তাকাতে দেখে হেসে বললে, 'আমি কফির ব্যবস্থা করি।'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

সে উঠে পাশের দরজা দিয়ে চলে গেল। মনে হল যেন যাবার সময়ে তার অপূর্ব দেহের শোভায় সে হিল্লোল তুলে দিয়ে গেল।

এ্যাডল্‌ফ্‌ বললে, 'সেন, তুমি যদি আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে মাফ করো তো আমি একটা কাজ সেরে আসি।'

বললাম, 'নিশ্চয়ই, আমার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি কাজ সেরে নাও।'

সে হেসে বললে, 'কাজটা বাইরে, আমি বেশী সময় নেবো না। শিগগীর ঘুরে আসবো। আমার মিসেস ততক্ষণ তোমাকে সঙ্গ দান করবে। অসুবিধা হবে না তোমার।'

আমি তার দিকে চেয়ে বললাম, 'তাহলে আমিও উঠি না আজ। কাল বরং আসবো একবার।'

এ্যাডল্‌ফ্‌ বললে, 'তা কি হয়! আমি নিয়ে এলাম নিমন্ত্রণ করে আর তুমি চলে যাবে! তুমি কিছু মনে করো না। আমার কাজটা বেশীক্ষণের নয়। যাবো আর আসবো।'

আমি বললাম, 'বেশ, আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে। তুমি ঘুরে এসো ততক্ষণ।'

এ্যাডলফ বললে, 'আমি দুঃখিত তোমাকে এ ভাবে ছেড়ে যাবার জন্যে। খুবই জরুরী দরকার, মনে ছিল না আগে। যা হোক, আমি তোমাকে আমার মিসেসের জিম্মা করে যাচ্ছি, সেই অতিথি সৎকার করবে। আর এ সব কাজে জানো তো পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী পটু।'

সে উঠে দাঁড়াল, তারপর ভেতরে চলে গেল।

আমি পাশের টেবিল থেকে একটি ম্যাগাজিন তুলে নিলাম।

একটু পরেই এ্যাডল্‌ফ্‌ ফিরে এল। বললে, 'মিসেস আসছে তোমার কফি নিয়ে। তুমি ততক্ষণ---'

সে থেমে গেল, তারপর কোণের টেবিলের ওপর রাখা একটি এ্যালবাম উঠিয়ে নিয়ে এসে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, বললে, 'ততক্ষণ এইটে দেখো বসে। আমার তোলা ফটো সব। লাইফ ষ্টাডি।'

এ্যাল্‌বামটা হাত বাড়িয়ে নিলাম। এ্যাডল্‌ফ্‌ দরজা খুলে বেরিয়ে গেল স্মিত হেসে।

আমি এ্যালবামটা খুলেই থমকে গেলাম! প্রথম পাতাতেই একটি ফটো—পূর্ণাবয়ব একটি যুবতীর নগ্ন দেহ। সিলুয়েটে তোলা। মুখখানি পাশ ফেরানো, কিন্তু যতটা অংশ দেখা যাচ্ছে মুখের, তাতে খুব চেনা লাগল তাকে।

পরের পাতা ওল্টাতেই দেখি আর একটি ফটো। সেটিও একটি সম্পূর্ণ নগ্ন যুবতীর। প্রথম ফটোটিও যে তার, সে কথা বুঝতে পারলাম।

আর পারলাম চিনতে সেই যুবতীকে—এ্যডল্‌ফের স্ত্রী ব্রিজিট, আমার সদ্য আলাপিতা !

কি অপূর্ব দেহ-সুষমা ! নিখুঁত ভাস্কর্যের নিদর্শন ! যেন পাথরে খোদাই করা ! পরপর দেখে গেলাম অনেকগুলি ফটো নানা ভঙ্গিতে তোলা, কোনোটা শুধু বুক পর্যন্ত, কোনোটা সম্পূর্ণ দেহ ! শোওয়া বসা দাঁড়ানো, নানা ভঙ্গি !

তন্ময় হয়ে যেন পান করছিলাম সেই নগ্ন দেহের সুরা ! কখন যে ব্রিজিট আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল কফির কাপ হাতে নিয়ে, বুঝতেও পারি নি।

সে হাসল, আমিও হাসলাম তার দিকে চেয়ে।

সামনা সামনি তাকে দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লাম। তারই নগ্ন দেহের ফটোর এ্যালবাম হাতে নিয়ে কি যে বলবো বুঝতে পারলাম না।

তাকিয়ে দেখলাম ব্রিজিট হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

বললে, 'কফি।'

আমি কফির কাপ হাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানালাম।

ব্রিজিট বললে, 'ফটোগুলি দেখছিলে ?'

'না, মানে—এ্যডল্‌ফ হাতে ধরিয়ে গেল এ্যালবামটা। আমি………' আর কথা জোগাল না মুখে।

ব্রিজিট আমার পাশে বসে পড়ল, বললে, 'তাতে দোষের কি হয়েছে ! এই ফটোগুলি এ্যডল্‌ফের ষ্টাডি। ও খুব ভাল ফটোগ্রাফর। প্যারিসের একটি বিখ্যাত বিউটি পত্রিকার ও ছিল ষ্টাফ ফটোগ্রাফার।'

আমি চুপ করে রইলাম।

ব্রিজিট বললে, 'এই ফটোগুলির অধকাংশই ঐ পত্রিকায় বেরিয়েছে। এ্যাডল্‌ফের বেশ হাত আছে ফটোগ্রাফীতে—তাই না ?'

সহজ অনাড়ষ্ট সপ্রতিভ কথা।

আমিও সহজ হয়ে উঠলাম। বললাম, 'ফটোগ্রাফার হিসাবে এ্যাডল্‌ফ্‌ নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু তার কৃতিত্বটা সম্পূর্ণ ই তার মডেলের জন্যে।'

ব্রিজিট হেসে বললে, 'কি রকম?'

বললাম, 'মডেল এত অপরূপ রূপসী যে তার ফটো তোলাতে ফটোগ্রাফারের কৃতিত্ব খুব বেশী আছে বলে মনে হল না!'

ব্রিজিট হাসতে লাগল।

ফটোগুলি দেখতে দেখতে মনে কি রকম যেন নেশা ধরে গেছিল। ব্রিজিটের দিকে হয়তো ঐ নেশার ঘোরেই তাকিয়ে ছিলাম। চোখে আমার নেশার ঘোর দেখে থাকবে ব্রিজিট। সে হেসে বললে, 'কি হল! কি দেখছ!'

বললাম, 'দেখছি তোমাকে। ভাবছি—'

'কি ভাবছ?'

'ভাবছি—নারী দেহের আকর্ষণ তার নগ্নতায় বেশী, না পোশাকের আবরণে!'

ব্রিজিট হেসে উঠল, জবাব দিল না কোনো।

আমি তার দিকে চেয়ে বললাম, 'এ্যাডল্‌ফ কখন আসবে?'

'কি জানি! তবে এক ঘন্টার আগে নয় নিশ্চয়ই!'

'এক ঘণ্টা!' আমি বলে উঠলাম, 'তবে যে সে বললে যাবো আর আসবো।'

'ঠিক বলেছে সে। তবে যেখানে গেছে সে; সেখানে যেতে খুব কম করে আধ ঘন্টা। তাই যাতায়াতে এক ঘণ্টা তো লাগবেই!'

'কি অন্যায়! আমাকে এ ভাবে বসিয়ে রেখে গেল!'

'কেন, তুমি তো আর জেনিভার হ্রদে পড় নি যে ভয় করবে!'

আমি হেসে বললাম, 'ভয় জেনিভা হ্রদকেও নয়। এ্যাটলান্টিককেও নয়!'

সে বললে, 'তবে?'

বললাম, 'ভয় নিজেকে!'

'সে আবার কি! নিজেকে ভয়?'

আমি কোনো কথা বললাম না। কিন্তু ব্রিজিটের দিকে তাকিয়ে সত্যই ভীত হয়ে উঠলাম। তার দু'চোখে কিসের যেন ইসারা অজানা রহস্যের হাতছানি!

ব্রিজিট উঠে দাঁড়াল, বললে, 'দেখে আসি ভিতরে একবার। রান্না চাপিয়ে এসেছি।'

সে দেহের হিল্লোল তুলে চলে গেল ভিতরে, সেই সঙ্গে তুলে দিয়ে গেল কামনার ঝড় আমার অন্তরে!

খানিক পরে ফিরে এল ব্রিজিট।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, 'অতিথিকে বসিয়ে রাখছি। কিছু মনে করো না।'

'মনে করার কিছু নেই,' আমি বললাম, 'তোমার রান্না করার কোনো দরকার ছিল না। আমি হোটেলেই খেতে পারতাম।'

ব্রিজিট হেসে বললে, 'আর আমরা বুঝি উপবাসী থাকতাম তুমি না এলে? আমাদের খাবারটা তো আর হোটেল থেকে আসতো না!'

'তা বটে।'

সে এবার সোফার ওপরে আমার গা ঘেঁষেই বসল। তারপর আমার হাতে ধরা ফটোর এ্যালবামটা নিয়ে বললে, 'ফটো দেখে কি করবে, আমি তো জলজ্যান্ত পাশেই বসে।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে কি বলবো ভেবে পেলাম না। দেখলাম কৌতুকে তার চোখ দু'টি নাচছে!

আমি জবাব দেবার আগেই সে আমার কোলের ওপর হাত তুলে ধরল, বললে, 'আমার হাত দেখ।'

আমি তার হাতের দিকে চেয়ে বললাম, 'আমি হাত দেখতে জানি না।'

'সে কি ! সব ভারতীয়রা হাত দেখতে জানে।'

'ভারতীয় মাত্রেই জানে না, এর চর্চা কিছু লোক করে বটে। তবে আমি ঠিক জানি না।'

'নিশ্চয়ই তুমি জানো। দেখ না!'

সে আমার হাতখানি চেপে ধরল।

মনে হল আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল! ফটোগুলি দেখা অবধি একটা নেশার মতো লাগছিল। ব্রিজিটের সুপুষ্ট যৌবন আমার দেহে মনে কামনার জোয়ার এনে দিয়েছিল।

কিন্তু সতর্ক হয়ে উঠলাম। অজানা অচেনা দেশ, সদ্য আলাপী পরিবার। বিস্ময়কর পরিবেশ ও স্বামী স্ত্রীর ব্যবহার—সব মিলে আমার মনে একটা ভয়ের ভাব এনে দিল। মনে হল কি যেন আছে এ সবের পেছনে! বেশ কিছু রহস্য যেন লুকিয়ে আছে কোথাও! আমি বিদেশী—শেষে কোন্ বিপদে পড়বো, সেই দুশ্চিন্তায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

আমার মুখে চোখে হয় তো দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে থাকবে, ব্রিজিট সেটা বুঝতে পারল। বললে, 'কি' ভয় করছে না কি?'

আমি কিছু বলার আগেই সে বললে, 'ভাবছ বুঝি তোমাকে কোনো বিপদে ফেলবার মতলব আমাদের?'

'না না, তা নয়।'

'ঠিক তাই,' সে বললে, 'আর সেটা মিথ্যেও নয়।'

আমি চমকে উঠলাম তার কথায়, 'তার মানে?'

'মানে আর কি? তুমি বিদেশী, তায় ছাত্র। তোমাকে সত্যিই বিপদে ফেলতে চাই না। তাই আমার সত্যিকার পরিচয় জানাচ্ছি। আমি—,

সে এক মুহূর্ত থামল, তারপর বললে, 'আমি প্রাইভেট প্রস্‌টিচিউট।'

সেই মুহূর্তে সেই ঘরে বজ্রপাত হলেও বিস্মিত হতাম না, যতটা

হলাম ব্রিজিটের কথায়। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় কেঁপে উঠল বুকের মধ্যে! কি সাংঘাতিক! কি ভয়ঙ্কর ফাঁদ!

ব্রিজিট বললে, 'কি, ভয় পেয়ে গেলে!'

আমি আতঙ্কে কথা বলতে পারলাম না।

সে বললে, 'ভয় নেই। আমি প্রসটিটিউট বটে, কিন্তু মানুষ: এটা আমার জীবিকা, কিন্তু প্রাণ ধারণ আর জীবন ধারণ এক নয়। তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি সেই দলের নও—যারা আমার কাছে রোজ সন্ধ্যে বেলায় আসে। এসে ফুর্তি করে যায় এই দেহটাকে নিয়ে কিছু টাকা ছড়িয়ে!'

দেখলাম ব্রিজিটের দু'টি চোখ জলে ভরে এসেছে। গলাটা কাঁপছে আবেগে।

আমি বললাম, 'এ্যাডল্‌ফ তবে তোমার দালাল! লোক ডেকে আনে এমনি করে!'

ব্রিজিট বললে, 'এ্যাডল্‌ফ, লোক ডেকে আনে ঠিকই, তবে সে দালাল নয়, সে আমার বিবাহিত স্বামী!'

চমকে উঠলাম তার কথায়। বললাম, 'কি বললে? এ্যাডল্‌ফ তোমার স্বামী!

'হ্যাঁ।'

বললাম, 'সেই তোমাকে এই পাপ ব্যবসায়ে নামিয়েছে?'

'ওর চাকরী নেই আজ ছ'মাস। আগে ফটোগ্রাফারের কাজ কর্ম করতো। আমাকে মডেল করে ছবি তুলে বেচতো। তাতে কোনো রকমে সংসার চলতো, কিন্তু, সেই সঙ্গে ওর মদের খরচা দ্বিগুণ বাড়তে থাকল। আপিসের টাকা চুরি করল। একদিন পড়ল পুলিশের নজরে। ধরে নিয়ে গেল তাকে জেলে। পাওনাদাররা এসে ওর দামী ঘড়ি ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে গেল। ফটো তোলা বন্ধ হল। চাকরী গেল। রোজগার গেল। ছ'মাস চেষ্টা করেও তার চাকরী জুটল না, চোরকে কে দেবে চাকরী? সংসার আর তার মদের খরচা যোগাতে শেষে আমাকে নামতে হল এই পথে!'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পকেট হাতড়িয়ে বেরোল কিছু সুইস ফ্র্যাঙ্ক ও একটি সুইস ডলার। সেগুলি ব্রিজিটের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বললাম, 'এই রইল। এর বেশী সঙ্গে নেই আর। আমি চললাম।'

আমি যাবার জন্যে পা বাড়ালাম। ব্রিজিট সেই মুদ্রাগুলি তুলে নিয়ে বললে, 'এ গুলি নিয়ে যাও। এ সবের প্রয়োজন নেই। আমি দেহ-জীবিনী বটে কিন্তু ভিখারিণী নই। যে সওদা তুমি করলে না, তার দাম আমি নিতে পারবো না।'

আমি তাকালাম ব্রিজিটের দিকে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম তার সংযত শিক্ষিত মার্জিত কথায়!

বললাম, 'আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। প্রসটিচিউশনকে আমি ঘৃণা করি।'

'প্রসটিচিউশনকে ঘৃণা করো!' ব্রিজিট তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠল, 'এই সভ্যতা তবে কি! প্রসটিচিউশন নয়? ভাবের প্রসটিচিউশন, কর্মের প্রসটিচিউশন, ধর্মের প্রসটিচিউশন, নীতির প্রসটিচিউশন, রাজনীতির প্রসটিচিউশন চলছে না পৃথিবীতে? একজন বিজ্ঞানী কি তার বিবেক খুইয়ে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র বানাচ্ছে না? সাহিত্যিক কি সংস্কৃতি ভুলে সামান্য পুরস্কারের লোভে নিজের গায়ে কাদা ছুঁড়ছে না? মাতছে না দলাদলিতে? রাজনৈতিক কি পার্টি ও নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যে জঘন্যতম কাজ করছে না? মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও শিক্ষার যদি প্রসটিচিউশন চলে, তবে দেহের প্রসটিচিউশন কেন চলবে না, বলতে পারো?'

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ব্রিজিটের সেই দীপ্ত মূর্তির দিকে চেয়ে শুনছিলাম তার শাণিত তরবারির মতো তীক্ষ্ণ কথাগুলি! এ কি একজন সামান্য দেহজীবিনীর কথা!

আমাকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে বললে, 'অবাক হয়ে গেছো, না? একজন সামান্য প্রসটিচিউটের কাছ থেকে আশা কর নি এ সব তত্ত্ব কথা শোনার, তাই না?'

আমি তবু নিরুত্তর হয়ে চেয়ে রইলাম। আমার কথা বলার ক্ষমতাও যেন চলে গেছিল।

সে এবার একটু হাসল, বললে, 'সেন, আমি ক্যাথলিক, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মরাল সায়ান্সের সেরা ছাত্রী ছিলাম একদিন! এ্যাডলফ্ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরে! আজ আমাদের এই অবস্থা! এর জন্যে কাকে দায়ী করবো বলতে পারো? সভ্যতাকে, সমাজকে, না নিজের অদৃষ্টকে!'

আমি এবার এগিয়ে গেলাম ব্রিজিটের দিকে। তার হাতখানি মুঠোয় ধরে বললাম, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো। না জেনে তোমাকে আঘাত করেছি। সেই আঘাত শতগুণে ফিরে এল আমার বুকে। কিন্তু ব্রিজিট, মরাল সায়ান্সের ছাত্রীর পক্ষে এর চেয়ে কোনো সম্মানজনক পথ খোলা ছিল না?'

সে বললে, 'এ্যাডলফ্ যখন চুরির দায়ে জেলে গেল, তখন আমি বেরোলাম চাকরী খুঁজতে। আমাকে সে আগে কখনো চাকরী করতে দেয় নি। সে জেলে যেতে তখন বাধ্য হয়ে বেরোতে হল। কিন্তু সুন্দরী যুবতীর, বিশেষ করে অভাবগ্রস্ত যুবতীর চলার পথ ফুলের নয় সেন, কাঁটার। তাই বেশী দিন কোথাও টিকতে পারলাম না। মরাল সায়ান্স আকণ্ঠ পড়া ছিল যে! তাই ইম্-মরাল হতে পারি নি! শেষে যখন এক বেলার আহারও যোগাড় করা শক্ত হল, তখন ভগবানের ওপর রাগ করে চরম পথটাই বেছে নিলাম! সেন, ইজ ইট্ নট্ এ্যান আইরনি অব ফেট্?'

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না।

ব্রিজিট মুদ্রাগুলি আমার হাতে দিয়ে বললে, 'এ গুলি নিয়ে যাও।' তারপর মুখে একটু হাসি টেনে বললে, 'আমার একটা দিনের উপার্জন তুমি মাটি করলে!'

সে হাসতে লাগল আর দু'টি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল চোখের জল!

লা পারিসিয়ানে

প্যারিসে রৌদ্র-ঝলমল গ্রীষ্মের এক সকালে—

'স্যেন' নদীর ধারে তিনশো মিটার উঁচু বিরাট লৌহ-সৌধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'আইফেল টাওয়ার'। তারই সর্বোচ্চ তলায় সৌধ-বেষ্টিত রেলিং দেওয়া গোল বারান্দা, একদিকে রেলিং-এর সঙ্গে লাগানো দুরবীণ। আশে পাশে ভ্রমণর্থীদের ঘোরা ফেরা, দোকানের পসরা।

দুরবীণের মধ্যে দিয়ে দেখছিলাম সম্মুখে ও পাদদেশে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ; আকাশ ও মাটির পটভূমিতে গড়ে ওঠা সৌন্দর্য-নগরী প্যারিসের নানা অঞ্চল : পথ ঘাট, উদ্যান, বাড়ি ঘর প্রাসাদ, রম্যস্মৃতি-চিহ্নগুলি ! দূরের 'আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ'-এর মাথায় জড়ো দর্শকদের ভিড়। তার নীচে দিয়ে প্রসারিত বারোটি পথের মিলন-স্থল দিয়ে বারো দিকে ধাবমান যানবাহন, পথচারি মানুষের মিছিল ; কত স্পষ্ট ও কত কাছে দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের ঐ দুরবীণের মধ্যে দিয়ে !

দুরবীণ ঘোরাতে গিয়ে বাধা পেলাম। মৃদু শব্দ কিসের সংঘর্ষে। চোখ সরিয়ে দেখি যার সঙ্গে দুরবীণটি ধাক্কা খেল-সে আমার পাশে রেলিং-এ ভর দিয়ে দণ্ডায়মান একটি যুবতী : অত্যন্ত সুন্দরী, হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, "দুঃখিত, তোমার নিশ্চয়ই আঘাত লেগেছে ?"

"অবশ্যই !" তার কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের মিষ্টতা, তার দু'চোখে কৌতুকের রেশ !

বললাম, "আমি দেখতে পাই নি।"

"ঠিক ঐ কারণেই আমার আঘাত লেগেছে, দুরবীণের ধাক্কায় নয় তোমার দৃষ্টি বহুদূর অবধি যায় বুঝলাম, কিন্তু অতি নিকটে যারা তাদের দেখতে পাও না !

অবাক হলাম তার সৌন্দর্যের মতোই বুদ্ধির ছটায় ! নির্ভুল সে ফরাসিনী, সাদা সার্টিনের আকনুই-বিস্তৃত নীচু করে কাটা আঁটো সাটো ব্লাউজে আটকানো পীবর বক্ষদেশ, সামনে ও কাঁধের অনেকখানি অনাবৃত, লাল ও কালো রংএর চেক স্কার্টের ফেরে সুডৌল ও প্রশস্ত

নিতম্ব। মাথার লাল চুল পিছনে দিকে হর্সটেল করে বাঁধা, প্রান্তদেশের কেশের গুচ্ছ কাঁধে লোটানো। ঠোঁটের প্রান্তে প্রসারিত হাসির ঝলক। মাদকতাময়ী, মনোলোভা!

আমি হাসলাম, বললাম, "ফরাসিনী?"

"কি করে বুঝলে?"

"তোমার সর্বাঙ্গ সে পরিচয় বহন করছে। ভুল বলেছি?"

"নির্ভুল। তুমি ভারতীয়, ঠিক না?"

"নির্ভেজাল, এখনো পর্যন্ত অবশ্য!"

সে একটু হাসল, আমার কথাবার্তায় সে কৌতূহলী হয়ে থাকবে। বললে, "এখানে যখন আমাদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত নেই, তখন প্রচলিত লৌকিকতা বাদ দেওয়া যাক, কি বল?"

"খুব সাধু প্রস্তাব, আমার সমর্থন আছে।" নিজের নাম বললাম।

"আমার নাম জ্যাকলিন দিফাদা।"

"একজন অত্যন্ত সুন্দরী যুবতীর উপযুক্ত নাম-জ্যাকলিন!"

সে হাসল আবার, বললে, "ভারতবর্ষ থেকে? ভ্রমণার্থী?"

"দুটোই মিলল না।" হেসে বললাম, "লণ্ডন থেকে, ছাত্র সেখানে।"

"আচ্ছা! তাই বল!"

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, "মানে?"

"মেয়েদের সঙ্গে আলাপে তোমার অতি-সপ্রতিভতার কারণ খুঁজে পেলাম!" জ্যাকলিন হাসল।

মুগ্ধ হচ্ছিলাম। তার যৌবন ও সৌন্দর্য যেমন আকর্ষণীয়, তার বুদ্ধিবৃত্তি কম আকর্ষণীয় নয়। ফরাসীরা যে বুদ্ধিমান, সৌন্দর্য-প্রিয় ও কৌতুক-প্রয়াসী জাতি তা জানতাম। জ্যাকলিন তার জাতির সংস্কৃতির নিখুঁত উদাহরণ।

আমি নীরবে দেখছিলাম তাকে। ভাবছিলাম।

"কোনো দুশ্চিন্তায় পড়লে ? অথবা কিছু হারিয়ে চিন্তান্বিত ?"

"কোনোটাই নয়। শুধু ভাবছিলাম তুমি একা, না সঙ্গী কেউ আছে ?"

"উপস্থিত একাই। কেন ?"

"তাহলে নীচে নেমে কোথাও দু'পেয়ালা কফি নিয়ে বসা যেতো আর পরস্পরকে ভালো করে জানার সুযোগ হতো! প্যারিসের এই জনারণ্যে তোমার মত সদ্য-পরিচিত একজন রূপসী যুবতীকে হারিয়ে যেতে দিতে চাই না!"

কৌতুকে হেসে উঠল জ্যাকলিন: তার চোখ দুটিও।

একটা ঝড়ো হাওয়ায় তার স্কার্টের প্রান্ত দেশ উঠে গেল খানিকটা, চুলের গুচ্ছ এলোমেলো হয়ে গেল। দু'হাতে দুদিকে সামলাতে সামলাতে বললে, "চল, যাওয়া যাক।"

"তার আগে ঐ দোকান থেকে কিছু কিনতে হবে, সুভেনির।"

জ্যাকলিন সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল ফরাসি সাহিত্য পড়েছিল, তারপর ছেলেবেলার ঝোঁক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সরে গেল। একটা আর্ট কোর্স শেষ করে কিছুকাল একজন বড় শিল্পীর কাছে কাজ করল, শেষে কিছু পয়সা জমিয়ে এ্যাভিনিউ দ্য মোপারনাসে যেখানে শিল্পী ও ভাস্করদের লীলাভূমি, সেখানে স্টুডিও করল।

নেপোলিয়ঁর যুগের একটি অত্যন্ত পুরোনো ভগ্নদশা প্রাপ্ত পাঁচতলা বাড়ির চার তলায় তার স্টুডিও।

ভিতরে ঢুকে জ্যাকলিন বললে, "এই আমার স্টুডিও।"

চারিদিকে তাকালাম। অবিন্যস্ত ভাবে রাখা ছবি আঁকার সাজ সরঞ্জাম ও উপকরণে পূর্ণ সমস্ত ঘরটি। মেঝে ও দেওয়ালে হেলানো সমাপ্ত অর্ধ-সমাপ্ত অয়েল পেন্টিং, ওয়াটার-কলার, প্যাস্টেল ড্রইং, পেনসিল স্কেচ; দেওয়ালে ঝোলানো কিছু সমাপ্ত ছবি; দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝের ওপরে রাখা কোথাও ফ্রেমের কাঠ, কোথাও

ক্যানভাসের ও ড্রইং পেপারের বাণ্ডিল। দুটি ইজেল পাশাপাশি দাঁড় করানো, একটিতে একটি ক্যানভাসে অর্ধ-সমাপ্ত একটি ল্যাণ্ড্স্-স্কেপ। দুটির মাঝখানে একটি নীচু টুলের ওপরে পোর্সিলেনের বোল, বহু-রং এর শিশি; জাগে রাখা নানা ধরণের তুলি ও পাশে রাখা রঙের প্যালেট।

একদিকে ম্যাণ্টলপিসের ওপরে ঝোলানো একটি বড় আয়না, তার ঠিক উল্টো দিকের দেওয়ালে টাঙানো পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের একটি অয়েল পেন্টিং। সম্পূর্ণ নগ্ন একটি যুবতী, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। লাস্যময়ী হাস্যময়ী। একটা লাল রঙের গাউনের এক প্রান্ত তার বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা, গাউনের বাকীটা তার নাভিকুণ্ডের পাশ দিয়ে পরিপুষ্ট কটিতটের ঢাল বেয়ে নেমে কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে পায়ের নীচে। ডান হাত যেন পায়ের কাছে লুটানো গাউনে তোলার জন্যে প্রসারিত। কাপড় পড়ে যাওয়ায় ঈষৎ কুণ্ঠিত। কিন্তু মুখ চোখের ভাবে মনে হচ্ছে যেন সে তার অতুলনীয় দেহ-সম্পদে গরবিনী।

অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য! প্রতিকৃতি বলা বাহুল্য জ্যাকলিনেরই।

ছবিটি দেখতে এত মগ্ন ছিলাম যে জ্যাকলিনের কথা আমি শুনতে পেলাম না। হঠাৎ তার দিকে ফিরলাম, সলজ্জভাবে সে দেখছে আমাকে।

"ওটি আমার সেল্ফ্-স্টাডি। ঐ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আঁকা!"

"অপূর্ব! কী সৌন্দর্য!" বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে বললাম।

"তোমার এই উক্তিটি আমার শিল্প-সৃষ্টির প্রতি, না মডেলের প্রতি?"

"দুই-এর প্রতিই প্রযোজ্য আমার এই উক্তি।" আমি হাসলাম।

"এ দুটোর মধ্যে তুলনা করতে পারো? কোন্টি তোমার চোখে বেশি সুন্দর? শিল্পীর নৈপুণ্য, না মডেলের সৌন্দর্য?" সে জানতে চাইল।

"এক্ষেত্রে শিল্পী ও মডেল দুজনেই এক এবং অভিন্ন। দুজনেই আত্মসচেতন। শিল্পী তার শিল্প-কলার নৈপুণ্যে, আর মডেলটি তার যৌবন ও দেহের সৌন্দর্যে! এ দু'জনের মধ্যে তাই তুলনা করা সম্ভব নয়!"

জ্যাকলিন হাসল, বললে, "খুব চালাক লোক তুমি, সন্দেহ নেই!"

আমি হাসলাম, কিছু বললাম না। তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম, আমার সে দৃষ্টিকে নিছক প্লেটোনিক বলা যায় না, তার যৌবন ও সৌন্দর্য আমার পৌরুষজাত কামনাকে হয় তো প্রকাশ করেছিল আমার দু চোখের চাহনীতে। সে সলজ্জ হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, "কফি খাবে, না কোনো পানীয় চলবে? বল কি পছন্দ?"

"ব্যস্ত হয়েও না!"

"তুমি আমার সম্মানিত অতিথি, সাহিত্যিক। শিল্পীর স্টুডিওতে এসেছ, অতিথির উপযুক্ত সমাদর তোমার পাওনা!"

সে কৌতুক করে বলে নি কথাটা, ভাব-গম্ভীর কণ্ঠেই বলল

বললাম, "যা তোমার ইচ্ছা, তাই আনো তবে।"

"আসছি এখুনি!" জ্যাকলিন পাশের প্যাসেজে ঢুকল, বললে, "ভিতরে আসবে না কি?"

"যদি আমাকে "উঁকি মারা টম' বলে না মনে করো!" আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

হাসল জ্যাকলিন, কিছু বলল না।

ছোট্ট এক সরু প্যাসেজ—বাথরুমে যাবার জন্যে। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি সরু ডিভান, মাথার কাছে রাখা একটি টি'পয়, তার ওপরে ছোট টেবিল ল্যাম্প। পায়ের দিকে একটা বুক র‍্যাক। আর্টের বই, এ্যালবাম ও বিখ্যাত শিল্পীদের জীবনী রাখা। দুদিকের দেওয়ালে টাঙানো ঐ সব শিল্পী ও ভাস্করদের পোরট্রেট।

র‍্যাকের ওপরে রাখা বই-এর পিছন থেকে একটা বোতল বার করল জ্যাকলিন। বললে, "কনিয়াগ!"

"দারুণ !"

সে পিছন থেকেই ছুটো গেলাস ও জলভরা বোতল বার করল। বললে, "এখানেই বসা যাক। ও ঘরে বসার তো ঠাঁই নেই।" বোতল খুলে গেলাসে পানীয় ঢেলে জল মেশালো আমার দিকে আমার সম্মতি লক্ষ্য করে। তারপর একটা গেলাস তুলে দিল হাতে, বললে, "চিয়ার্স।"

"চিয়ার্স !" আমরা আরাম করে ডিভানে বসলাম।

বললাম, "ফরাসীদের কাছে পানীয় হল জল খাবার মতো সহজ ব্যাপার।"

"ফরাসীরা পানীয় ভক্ত, তাই বলে তারা সবাই আর মাতাল নয়।"

হাসলাম। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

"কি ভাবছো, সেন ?"

"কত কি !"

"শুনি কিছু। অবশ্য সে সব ব্যক্তিগত হলে আলাদা কথা।"

একটু চুপ করে বললাম, "প্যারিসে এটি আমার তৃতীয় সফর। এখানে প্রতিবারেই নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশেছি। ধনী, নির্ধন, মধ্যবিত্ত, বিভিন্ন কর্মে ও বাণিজ্যে লিপ্ত মানুষ। তাদের মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও আছে। ফরাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আমি ভক্ত।"

জ্যাকলিন শুনছিল, আমি থামলেও সে নীরবে চেয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম, "ফরাসীরা জানে জীবনকে উপভোগ করতে, হাসি খুশী আনন্দে উচ্ছলতায় ভরে দিতে। নাচে, গানে, ছবি আঁকায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায়, উদ্যান রচনায়, 'স্তেন' নদীর পাড়ে জ্যোৎস্নালোকিত রাতে প্রেমের তপস্যায়—সব কিছুর মধ্যে তারা পায় অফুরন্ত আনন্দ।"

আমি একটু থামতে জ্যাকলিন কি যেন বলতে গেল, তারপর চুপ করে গেল।

"অনেকবার ভেবেছি ফ্রান্সে কি দুঃখ দুর্দশা অভাব দারিদ্র্য নেই ?

তাদের কি কোন সমস্যা নেই ? আছে, সব আছে। তাই বলে কি পড়ে থাকবো তাই নিয়ে! যা পেয়েছি, যা পাচ্ছি, তাতেই আমার অধিকার। কী পাইনি তার হিসাব তারা মেলাতে বসে না, তাই তাদের দুঃখ দুর্দশা বেদনা দারিদ্র্য তাদের অন্তরকে স্পর্শ করলেও গভীর অতলে শিকড় গেড়ে বসে না বলেই তারা পারে জীবন উপভোগ করতে !"

আমি থামতে জ্যাকলিন বললে, "এমন করে নিজের জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করি নি কোনোদিন। তুমি আমাদের মানসিকতার মূল সুর যেন ধরিয়ে দিলে !"

আমি বললাম, "আমার চারদিকের আনন্দময় পরিবেশ ও মানুষদের দেখি আর ভাবি এদেরই পূর্ব পুরুষরা একদিন দুর্জয় বাস্তিল অবরোধ করে ধ্বংস করেছিল অত্যাচারি রাজার বন্ধন, তারা তাদের সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, রাজ-পরিবার ও রাজ পুরুষদের বিনা দ্বিধায় নির্বিচারে গিলোটিনে মাথা কেটে নিয়েছিল ! ঘোষণা করেছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী ! তারাই তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবদান রেখে গেছে দর্শনে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাটকে ! তারাই তো দিয়েছে বিশ্বকে উপহার নানা পোশাকের বাহার, সৌখীন সুগন্ধি সম্ভার ! সৌন্দর্য সৃষ্টিতে, জীবন ব্যঞ্জনায় তারা সম্পূর্ণ মুক্ত মন, সংস্কার শূন্য, সকল গোঁড়ামির উর্ধে। তারা পৃথিবীর সব দেশের দিকে তাকিয়ে থাকে, অন্যের মধ্যে যা পায় গ্রহণ করে, অন্যদের দানেও তারা সমান আগ্রহী। তাদের মধ্যে আছে জীবন-বোধের দুটি মূল মন্ত্র- 'নিজে বাঁচো, অপরকেও বাঁচতে দাও।' এবং 'তোমার যতটা সাধ্য দাও, যতটা পারো নাও।' এতেই তুমি পাবে বাঁচার আনন্দ !"

পানীয় পড়ে ছিল গেলাসে, আমরা দু'জনে তখন যেন ভিন্ন লোকে ঘুরছি, বর্তমান পিছনে রয়েছে পড়ে। বলার তাগিদ পেয়ে বসেছিল আমাকে, শোনার জন্যে উদগ্রীব জ্যাকলিন।

আমি জ্যাকলিনের ধীর স্থির মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি টেগোরের নাম শুনেছ জ্যাকলিন ?"

"আঁদ্রে জিদ-এর 'গীতাঞ্জলির' অনুবাদ আমি বহুবার পড়েছি। এক সময়ে আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন টেগোর।"

"টেগোরের একটি রূপক নাটক আছে—'ডাকঘর'। যে জীবন-বোধের দর্শন এতে টেগোর দিয়েছেন তার সঙ্গে মিল আছে ফরাসীদের জীবন-বোধের। শাস্ত্রের বুলি কপচিয়ে বা তার বিকৃত অর্থ করে জীবনকে যারা সকল রকম আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাখে তারা অসময়ে মৃত্যুকে আহ্বান করে আনে। ফরাসীরা তা করে নি কখনো, তাই তাদের জীবন দর্শনের সঙ্গে টেগোরের জীবন-দর্শনের মিল ছিল বলেই গত মহাযুদ্ধের সময়ে ফরাসীদের জীবনের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে, প্যারিসের পতনের রাত্রে, প্যারিস রেডিওতে তারা 'ডাকঘর' অভিনয় করেছিল।"

জ্যাকলিন অভিভূত স্তব্ধ হয়ে বসেছিল, চোখ দুটি মোহাচ্ছন্ন। ঘরের বাতাস যেন ভারী হয়ে গেছিল, হালকা মেজাজ গম্ভীর সুরে বাঁধা পড়েছিল।

লক্ষ্য করে পরিবেশ সহজ করার জন্যে বললাম, "আমার সিসেরোর বক্তৃতা কেমন লাগল জ্যাকলিন?"

সে কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু সে যে অভিভূত, আনন্দিত সে কথা তার চোখ মুখই বলে দিচ্ছিল।

প্যারিসে আমার সাতদিন থাকার কথা ছিল, কিন্তু আরো কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল ঝড়ের বেগে। জ্যাকলিন যেতে দিচ্ছিল না।

আমিও নিজেও গরজ করছিলাম না। হাতে ছুটি ছিল, তাই তাড়া ছিল না লণ্ডনে ফেরার। প্যারিস এবং ফরাসী সংস্কৃতি আমাকে বরাবর আকৃষ্ট করত। এবারের ভ্রমণের বাড়তি আকর্ষণ—জ্যাকলিন!

জ্যাকলিনের সঙ্গে যেতাম লুভ্‌র্‌ ম্যুজিয়মে, নতরদাম গীর্জায়, ভার্সাই রাজাপ্রসাদে; ঘুরে বেড়াতাম উদ্যানে উদ্যানে, প্লাস দ্য'লা কঁকর্দ-এ, মাদ্‌লিনে। সাঁজ এলিজের জনবহুল পথে ঘাটে। সন্ধ্যের পর আলো

ঝলমল মোমার্তের অলি গলি চষে বেড়াতাম। পৃথিবী বিখ্যাত 'ফলি বর্জয়' ও 'ক্যান ক্যান' নাচ, 'মেয়লে'র হলে সুন্দরীদের অর্ধ-উলঙ্গ 'নাচ-গান হল্লা,' রু ফঁতেঁ এবং রু পিগালের আনাচে কানাচে কাফে, বারে ঘোরা, নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে দেখতাম। আবার কখনো চলে যেতাম লাতিন কোয়ার্টার-এ যেখানে বিখ্যাত ফরাসী 'সাঁলোঁর' বৈঠকে শুনতাম কখনো ফরাসী বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিকদের বক্তৃতা আলোচনা। জ্যাঁ পল সার্ত্র, আলবেয়ার কামু, পোল ক্লোদেল, সিমন দ্য বুভে'র বক্তৃতা শুনে উত্তেজনায় শিহরিত হতাম।

দিনের বেলায় কাটতো জ্যাকলিনের স্টুডিওতে। জ্যাকলিন ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকতো, প্রদর্শনীতে বা বিক্রির জন্যে ছবি পাঠাতো এজেন্টেদের দ্বারা, ব্যস্ততায় কাটতো তার। আমি মাঝে মাঝে তার কাজ দেখতাম, কখনো বানাতাম কফি, বা পানীয় ঢেলে তাকে দিতাম, নিজেও খেতাম। কখনো বা আলস্যভরে প্যাসেঞ্জের ডিভানে গড়িয়ে দিবানিদ্রার সুখ অনুভব করতাম, জ্যাকলিনের আর্টের বই ও এ্যালবামের পাতা ওল্টাটাম, নয় তো জ্যাকলিনের অবসর মুহূর্তে তার সঙ্গে গল্প করতাম, কোনো ফরাসী বই-এর থেকে অংশ বিশেষ পড়ে শোনাতাম। দুপুরের খাবার খেয়ে আসতাম এক ফাঁকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা কমদামী রেস্তোরাঁয় দুজনে মিলে।

সন্ধ্যে হলেই জ্যাকলিন তুলি ও প্যালেট নামিয়ে রাখতো টুলে। এ্যাপ্রন ছেড়ে রেখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকতো। স্নান ও পরিচ্ছন্নতার পর সাজ করে সে বেরোতো—অপূর্ব লাগতো তাকে দেখতে। তখন সে আর সাধনায় নিবিষ্ট শিল্পী নয়, সে তখন মোহময়ী লা পারিসিয়ানে! আমরা দুজনে বেরিয়ে পথে নামতাম পৃথিবীর বুকে, দুলে চলে বেড়ানো দুটি মানব-শিশুর মতো! দু'হাজার বছরের যুবতী সুন্দরী প্যারিস ও পঁচিশ বছরের রূপসী জ্যাকলিন তখন আমার মন কেড়ে নিয়েছে সম্পূর্ণভাবে!

জ্যাকলিন আমার পোরট্রেট আঁকছিল ক'দিন ধরে। ফলে কদিনই দিন ও রাতটা স্টুডিওতেই আটকে পড়েছিলাম। অনেক রাত অবধি সে আঁকতো, আমি তার সামনে 'মডেল' হয়ে টুলে বসে থাকতাম।

দেখতে দেখতে আমার ছুটি ফুরিয়ে এল, যেতে হবে। পরদিনই চলে যাবো প্যারিস ছেড়ে—এবার বিদায় শুধু প্যারিসকেই নয়। এবার বিদায় নিতে হবে জ্যাকলিনের কাছেও!

জ্যাকলিন বাকী কাজ শেষ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্যারিস ছাড়ার আগের দিন রাত্রে সে আমাকে সারাক্ষণ টুলের ওপর বসিয়ে রাখল, নিজেও একটু বিশ্রাম নিল না। একাগ্রচিত্তে সে ক্যানভাসের ওপর রংএর ছোপ দিতে লাগল।

আমি তাকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কাল এই সময়ে আমি প্যারিস ছেড়ে গেছি। জ্যাকলিনকে ছেড়ে যাবার বেদনায় ভারাক্রান্ত মন। জ্যাকলিনও আজ তার কাজ স্থির হতে পারছিল না, তার মনও যে অত্যন্ত অশান্ত, ভিতরে তার ঝড় বইছে, বুঝতে পারছিলাম।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, রাত তখন একটা।

অনেকবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাকে বলতে চেয়েছি সময়ের কথা। সে যেখানে থাকে প্যারিসের সেই শহরতলী বহু মাইল দূর। শেষ বাস ও মেট্রো কখন চলে গেছে, অতদূরে এখন কোনো ট্যাক্সিও যাবে না। গেলেও এক একটি রূপসী যুবতীর যাওয়া নিরাপদ নয়।

কিন্তু জ্যাকলিনের কাজের মেজাজ দেখে চুপ করে গেছি প্রতিবার।

অবশেষে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্যালেট ও তুলি রেখে দিল। বললে, "আঃ. শেষ হলো।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, "কি রকম হয়েছে বল?"

আমি পোরট্রেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, "চমৎকার! ঠিক আমার মতোই দেখাচ্ছে ওকে!"

"ননসেন্স! এটা তোমারই তো ছবি!" সে থামল, তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা, বললে, "কিন্তু এখানে যার ছবি আঁকলাম সে

তার বাস্তব জীবনে এত সুন্দর নয় তাই বলে! ছবিকে সুন্দর করার জন্যেই ওকে বেশি সুন্দর করতে হল!"

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, বললাম, "যতক্ষণ তুমি ছবি আঁকছিলে ততক্ষণ ছিলে শিল্পী, এখন একজন নারী! ছলনার কপটতার অপর নাম নারী!"

জ্যাকলিন খিল খিল করে হাসতে লাগলো।

"কিন্তু প্রিয় বান্ধবী জ্যাকলিন, এবার ঘড়িটার দিকে একটু তাকাবে কি?"

সে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল, "এ কি! রাত দুটো!"

"ঘড়ির কাঁটা তাই বলছে বটে!"

"আমি না হয় এতক্ষণ আঁকায় ব্যস্ত ছিলাম, হুঁস ছিল না। তুমি কি করছিলে? তুমি বলনি কেন?"

"তুমি তো আমার ওপর কারফ্যু জারি করে রেখেছিলে! তোমার 'মডেল' হয়ে বসেছিলাম যে! আমার নড়া চড়া কথা বলা সব বন্ধ্। বলবো, কি করে!"

"তুমি নিপাত যাও, ঠাট্টা ভাল লাগছে না! এখন কি করি?"

"এইখানে ডিভানের ওপর সকাল অবধি নিদ্রা দাও।"

"সে হয় না! আমি এখানে কখনো রাত্রে থাকি না। বিপদজনক!"

"কা—ই! এখানে রাতে ভূত প্রেতের আমদানি হয় না কি?"

"ভূত প্রেতের সঙ্গে তুমিও নিপাত যাও! আমি যখন উদ্বিগ্ন হয়ে মরছি তখন উনি এলেন তামাশা করতে! ও সব অন্য সময়ে করবে, বুঝেছ?"

"বুঝলাম!"

সে রীতিমতো চিন্তান্বিত হয়ে উঠল।

"এখন কি আর করবে তাহলে? শান্ত হয়ে রাতটা কাটিয়ে দাও এখানেই।"

"বললাম না মিঃ সেন, এখানে রাত কাটানো সম্ভব নয়! বাড়ি-

ওয়ালা এই ঘর আমাকে রাত কাটাবার বা পুরুষ নিয়ে ফূর্তি মারার জন্যে ভাড়া দেয় নি। সে-সর্ত হয়নি তার সঙ্গে! যমের অরুচি বুড়ো বাড়িওয়ালা আমার ঘরের ঠিক উল্টো দিকের ফ্ল্যাটেই থাকে। ইনসমনিয়া তার, ঘুমোতে পারে না রাতে; তার একমাত্র নাতি থাকে সঙ্গে। তার মতো দুশ্চরিত্র ছোকরা এই বয়সে আর দেখা যায় না! একদম বখে গেছে। তার চেয়ে বেশি বয়সের কয়েকটি মেয়েকে ধর্ষণ করার অভিযোগে পুলিস কেস-এ পড়েছিল এরই মধ্যে। বাড়িওয়ালা ওকে নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকে। সেজন্যে কোনো অল্প-বয়সী পুরুষ-অভিভাবকহীন অবিবাহিত মেয়েকে এ বাড়িতে ঘর দেয় না, রাত কাটানো তো দূরের কথা! যদি বুড়ো জানতে পারে আমি রাতে এখানে আছি তাহলে বাড়ি মাথায় করবে!"

সত্যিই তাহলে দুশ্চিন্তার বিষয়!

সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল চিন্তাগ্রস্ত হয়ে।

বললাম, "তোমার বাবা মাও তো ওদিকে এতক্ষণে বাড়ি মাথায় করছেন?"

"সেদিকে খুব বেঁচে গেছি! ভয় নেই। কাল বাবা মা নীস-এ গেছেন বেড়াতে আর দাদা আঁরি গেছে বৌদি লুসেৎকে নিয়ে বারগণ্ডিতে শ্বশুর বাড়ি। তাই রক্ষে, না হলে এতক্ষণ পুলিস নিয়ে তারা খোঁজাখুঁজি শুরু করতো!"

"খোদা রক্ষা করেছেন বল!" আমি একটু হাসলাম, "যদি পুলিস একজন ফরাসিনী শিল্পীর স্টুডিওতে একটা কালো লোককে মাঝরাতে পেতো তাহলে তো সোনায় সোহাগা হতো! উঃ।"

"তুমি থামবে কি দয়া করে?" জ্যাকলিন ভ্রূ কুঁচকে বললে, "আমাকে একটা উপায় ভাবতে দাও।"

আমি হাসলাম আর তার পায়চারী করা দেখতে লাগলাম।

একটু পরে সে আমার সামনে দাঁড়াল। "তুমি তো হোটেলে ফেরার জন্যে ট্যাক্সি পাবে। শহরে সারা রাত ট্যাক্সি চলে।"

"ঠিক।"

"ওঠো তাহলে। যমের অরুচি বুড়োটা আমাদের দেখার আগে কেটে পড়ি।"

"কিন্তু কোথায় ?"

"বলা বাহুল্য তোমার হোটেলে! আজ রাতের বাকী সময়টা তোমার অতিথি হবো। জানি তোমার খাট বেশ বড়, দুজনকে অনায়াসে ধরবে।"

হাঁ করে জ্যাকলিনের দিকে তাকালাম।

"জলদি ওঠো, মশায়।"

আমি বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

আমার খাটটা দুজনের শোবার পক্ষে বড়ই, কিন্তু দুটি পুরুষ ও নারী যাদের মধ্যে বৈবাহিক বা প্রেমজ কোনো সম্পর্ক নেই —তেমন দুজনের জন্যে নয়!

জ্যাকলিন আমার দিকে পিছন ফিরে লম্বা হয়ে শুয়েছিল। তার সামনে দেওয়াল ঘেঁষে একটি আয়নাওয়ালা ড্রেসিং টেবিল।

ঘরের আলো নেভানো। রাস্তার আলো ফ্রেঞ্চ জানালার শার্সি ভেদ করে ঘরের মধ্যে পড়েছে, তারই আলোয় সামান্য আলোকিত কোনো কোনো অংশ। আধো আলো আধো অন্ধকারে ঘরখানা রহস্যময় হয়ে উঠেছে, রহস্যময়ী মনে হচ্ছে জ্যাকলিনকে!

শোবার আগে পাশে বাথরুমে স্নান করেছে জ্যাকলিন। তার গাউন, পেটিকোট করসেট ঝুলছে ঘরের দরজায় লাগানো হুকে। তার পরনে ব্রা ও আণ্ডি, আর আমার সিলকের ড্রেসিং গাউন। গাউনের কোমরের দড়ি বা স্ট্র্যাপ নেই, তাই সামনের দিকে একটা গেরো দিয়েছে জ্যাকলিন, ঢিলে হয়ে আছে সেটি।

আমার পরনে সার্ট ও ট্রাউজার। গরম কাল, তাই কারো গায়েই কম্বল চাদর ঢাকা নেই।

হোটেলে এসে আমাদের কোনো কথা হয় নি। সারা দিনের পরিশ্রমে জ্যাকলিন ক্লান্ত ছিল। সে স্নান সেরে পোশাক ছেড়ে সটান এলিয়ে পড়েছিল খাটের ওপরে। তারপর চোখ বন্ধ করেছিল, ঘুমোচ্ছিল কি না টের পাই নি তার নিস্পন্দ দেহ দেখে।

আমার ঘুম আসছিল না। চোখের পাতা বন্ধ হয় নি এক মুহূর্তের জন্যেও। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখছিলাম তাকে। তার চোখের ওপরে টানা সরু ভুরু দুটি একটু কুঁচকে আছে, ওষ্ঠ একটু খোলা। ড্রেসিং গাউনের আবরণে তার যৌবনপুষ্ট দেহের আঁক বাঁকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। লাল চুলের গোছা খোলা, বালিশে ছড়ানো।

মনে হচ্ছিল বুঝি অনন্ত কাল ধরে এক রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে, আর আমি জেগে বসে দেখছি তাকে অনন্ত কাল ধরে!

হঠাৎ সে পার্শ্ব পরিবর্তন করল, চিৎ হয়ে শুল। দেহের চাপে ড্রেসিং গাউনের আলগা গেরো খুলে দেহের দু'পাশে পড়ে গেল। উন্নত পীন স্তন দুটি বলগাহীন ব্রার মধ্যে মৃদু শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠা নামা করতে লাগল। ভেলভেটের মতো মসৃণ কাঞ্চনজঙ্ঘা, দেহের চাপে অল্প পিষ্ট সুডৌল নিতম্ব। যেন আগুনের মতো জ্বলছে যৌবন তার, যে যৌবনের তাপে তমাম প্যারিস শহর পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে!

দৃশ্যটি উত্তেজিত ক্ষিপ্ত করে তুলল আমাকে!

তার সঙ্গে পরিচয়ের চোদ্দ দিন ও রাতের প্রতি মুহূর্ত আমি নিজেকে সংযত রেখেছি। শান্ত থেকেছি। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে, এমন সুযোগ ঘটেছে যাতে আমাদের আবেগ তীব্র হতে পারতো অনায়াসে, যে আবেগের প্রাবল্যে আমরা হারিয়ে যেতে পারতাম সম্ভোগ-বিলাসের উন্মত্ত আনন্দে! কিন্তু আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, কোনো ভাবে মনকে উদ্দীপ্ত করি নি। তার দিক থেকে এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত আভাষ পাই নি, যদিও সর্বক্ষণ আমরা সব রকম আলোচনা করেছি, মঞ্চে উলঙ্গ নাচ, নাইট ক্লাবে স্ট্রীপ টিজ পাশাপাশি বসে দেখেছি, 'ন্যুড' ছবি ও ন্যুডিস্ট আন্দোলন নিয়ে অনেক আলোচনা

করেছি! আমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নই যে নারী আমার কাছে নরকের দ্বার! আমি জানতাম জ্যাকলিন ভালবাসে একটি ফরাসী ভাস্করকে, তাকেই সে বিয়ে করবে। সে উপস্থিত আমেরিকায়।

এই কারণে আমি জ্যাকলিনের সঙ্গে কোনো মানসিক বা শারিরীক বন্ধনে জড়াতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা দু'জনে ঘনিষ্ট বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছিলাম, এর বেশি নয়। এর বেশি যদি কিছু চাইতাম, হয়তো এ বন্ধুত্বের বন্ধন আমাদের ছিন্ন হোত।

আর এক কারণে আজ রাতে আমার সমস্ত আবেগ ও কাম-বাসনাকে বরফ দিয়ে আমি চাপা রেখেছিলাম। ট্যাক্সি করে হোটেলে আসার সময়ে জ্যাকলিন আমার হাত ধরে বলেছিল, "শেখর, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?"

যতই আমি বাসনা-পীড়িত হই, যতই হই না কেন ক্ষত বিক্ষত দেহে মনে ঐ অপরূপ দেহ-সম্ভোগের লোভে, তার বিশ্বাস আমি নষ্ট করতে পারি না!

কিন্তু একই খাটে তার মতো রূপসীর পাশে কাম-বাসনাহীন হয়ে শুয়ে থাকাতে তো অসীম মানসিক শক্তির দরকার! আজ আমার যেন অগ্নি-পরীক্ষা, আমি স্থির করেছিলাম, এ-পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হবোই!

ঘড়ির রেডিয়াল ডায়ালের কাঁটার দিকে তাকালাম, চারটে বেজে গেছে। দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে উঠল। আমি উঠে আমার দাড়ি কামাবার সেট, তোয়ালে ও পোশাক নিয়ে বাথরুমে চলে গেলাম।

যখন এ ঘরে ফিরে এলাম দেখি সূর্যের সোনালি আলোয় ঘরখানি আলোকিত। জ্যাকলিনের ঘুম ভেঙে গেছে, সে বিছানার ওপরে বসে আছে। ড্রেসিং গাউনে জড়িয়ে সামনের দিকটা দু'হাতে ধরে রেখেছে।

"সুপ্রভাত মাদ্‌মোয়াজেল! ভাল ঘুম হয়েছিল তো?" আমি হাসলাম। সে কোনো উত্তর দিল না। উঠে হোলডারে ঝোলানো তার জামা কাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ক্যালে থেকে ভোভার যাবার বোট ট্রেণ গার-দু-নরদ স্টেশনে দাঁড়ানো। এখনি ছাড়বে। একটা ছোট খালি কামরায় বসেছিলাম, পাশে জ্যাকলিন।

হোটেলে সকালে প্রাতঃরাশ সারার পর আমরা বেরিয়ে গেছিলাম। আমার প্যারিস বাসের শেষ দিন, অনেক কাজ ছিল, যাবার ছিল বহু জায়গায়। জ্যাকলিনেরও কাজ ছিল, সেজন্যে সারাদিন আর ফিরে দেখা হয় নি আমাদের। একটু আগে জ্যাকলিন এসেছে স্টেশনে আমাকে বিদায় জানতে। ক্লান্ত, অবসন্ন, বিষণ্ণও।

কথা বিশেষ নেই। বিদায়ের লগ্ন আসন্ন, তাই দুজনের হৃদয়ই বিষাদে পূর্ণ। লণ্ডনে কিছুকাল কাটিয়ে আমার দেশে ফেরার কথা, তাই এই যাত্রাই প্যারিসে আমার শেষ আসা। জ্যাকলিনের সঙ্গেও আর কোনোদিন দেখা হবে না!

হঠাৎ জ্যাকলিন অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে, "একটা কথা বলবো শেখর?"

"নিশ্চয়ই। বল।"

"তুমি একজন বিশুদ্ধ ভদ্রলোক, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। তুমি একজন পাকা নীতিবাগীশও। তোমার কাছে নৈতিকতার চেয়ে বড় বোধহয় আর কিছু নেই! তাই না?"

অবাক হয়ে শুনছিলাম তার কথা। জবাব দিতে পারলাম না।

সে বললে, "কাল রাতে যখন তোমার সঙ্গে তোমার হোটেলে গেলাম রাত কাটাবার জন্যে, তখন আমি তীব্র ভাবে নিজেকে দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম! শুধু তোমার চাওয়ার অপেক্ষা! শুধু প্রত্যাশা, তুমি আমাকে টেনে নেবে তোমার বুকের মধ্যে! যদি নিতে, কাল আমার সব কিছু পেতে তুমি!"

সে থামল; দীর্ঘ নিঃশ্বাস তার বুক চিরে যেন বেরিয়ে এল, বললে, "আসলে কাল রাতের দেরী করার ঘটনাটা আমারই সৃষ্টি।

ইচ্ছে হয়েছিল, আমাদের জীবনের শেষ রাতটা এক সঙ্গে কাটাবো, আমাকে মনে রাখার মতো কিছু দেব তোমাকে। আমার মনের কথা বোঝা উচিত ছিল তোমার। কিন্তু ট্যাক্সিতে আসার সময়ে আমার ছলনাপূর্ণ কথাগুলিকেই তুমি সত্য বলে ধরলে। আমার মনের আবেগ অনুভূতি কিছুই ধরতে পারলে না তুমি।”

সে আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল, আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ। ভাষা গেল হারিয়ে বেদনার অতলান্ত গভীরে!

হতবাক মুহ্যমান আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। নীতিবাগীশ আমি নই। নারীর মূল্য দিতে জানি, কিন্তু ট্যাক্সিতে তার কথাগুলি আমার সুপ্ত অভিমানকে জাগিয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘ চোদ্দ দিন ও রাতের মধ্যে যে এত নিস্পৃহ সংযত আচরণ করেছে এই ব্যাপারে, সে শেষ রাতে নিজেকে হারিয়ে যেতে দেবে—এ কথা মনে হয় নি। তীব্র অভিমান তাকে আমার ভুল বোঝায় সাহায্য করেছিল।

আমি তাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতে গেলাম, বুকের ওপরে নিয়ে চুম্বন করার জন্যে ধরতে গেলাম, সে ক্ষিপ্র ভাবে ‘না’ বলে উঠে পড়ল। তার সেই আবেগ-কম্পিত, ক্রন্দনে মথিত ছোট্ট ‘না’ শব্দ খালি কামরার আনাচে কানাচে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ‘না! না!’

জ্যাকলিন একটু হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কোণ দিয়ে! পর মুহূর্তে সে কামরা থেকে নেমে পড়ল প্ল্যাটফরমে।

ট্রেণ চলতে শুরু করেছিল ধীর গতিতে, সে সঙ্গে সঙ্গে এগোল, হাত তুলে নাড়তে লাগল আমার দিকে তাকিয়ে, জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল তার ছু’টি গাল বেয়ে।